বাতায়ন

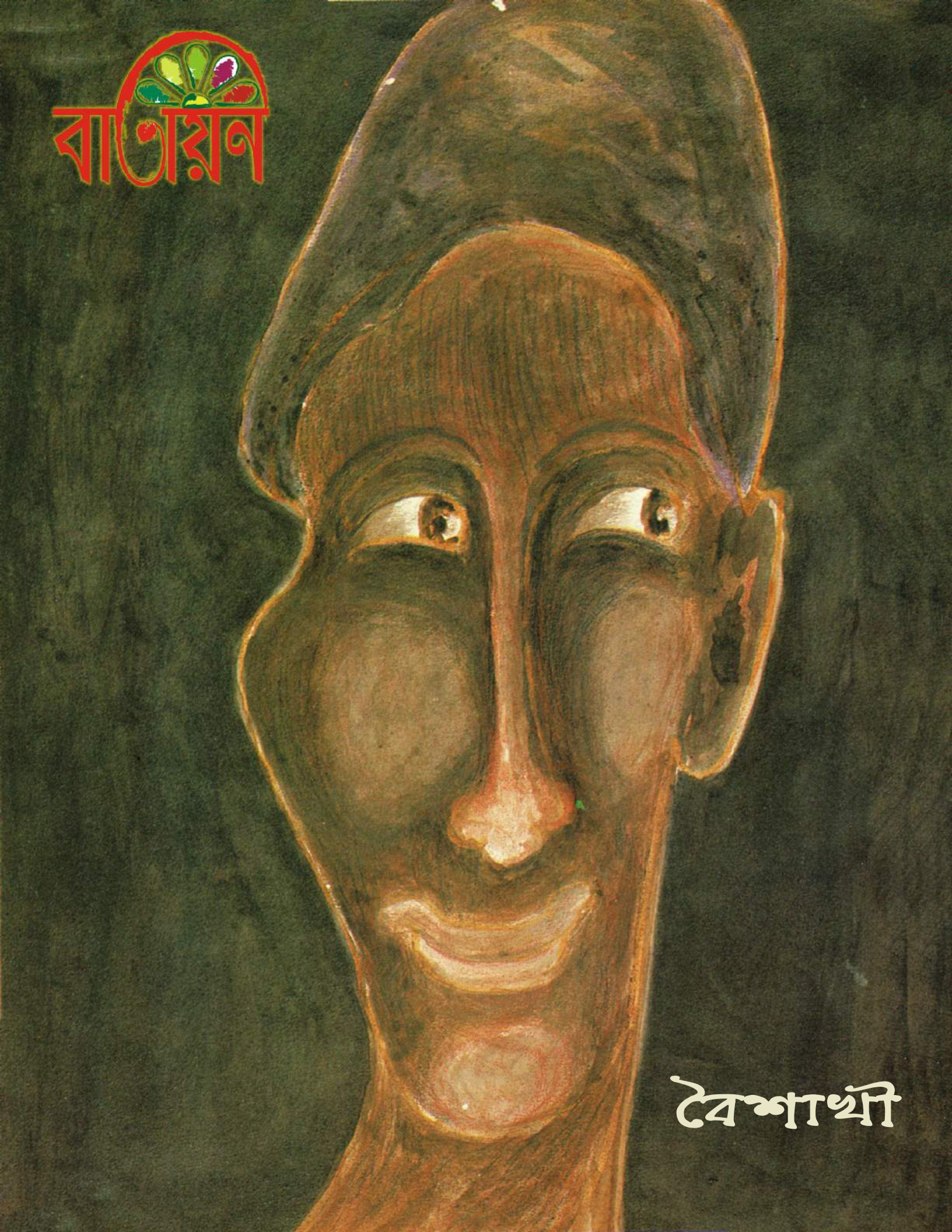

বৈশাখী

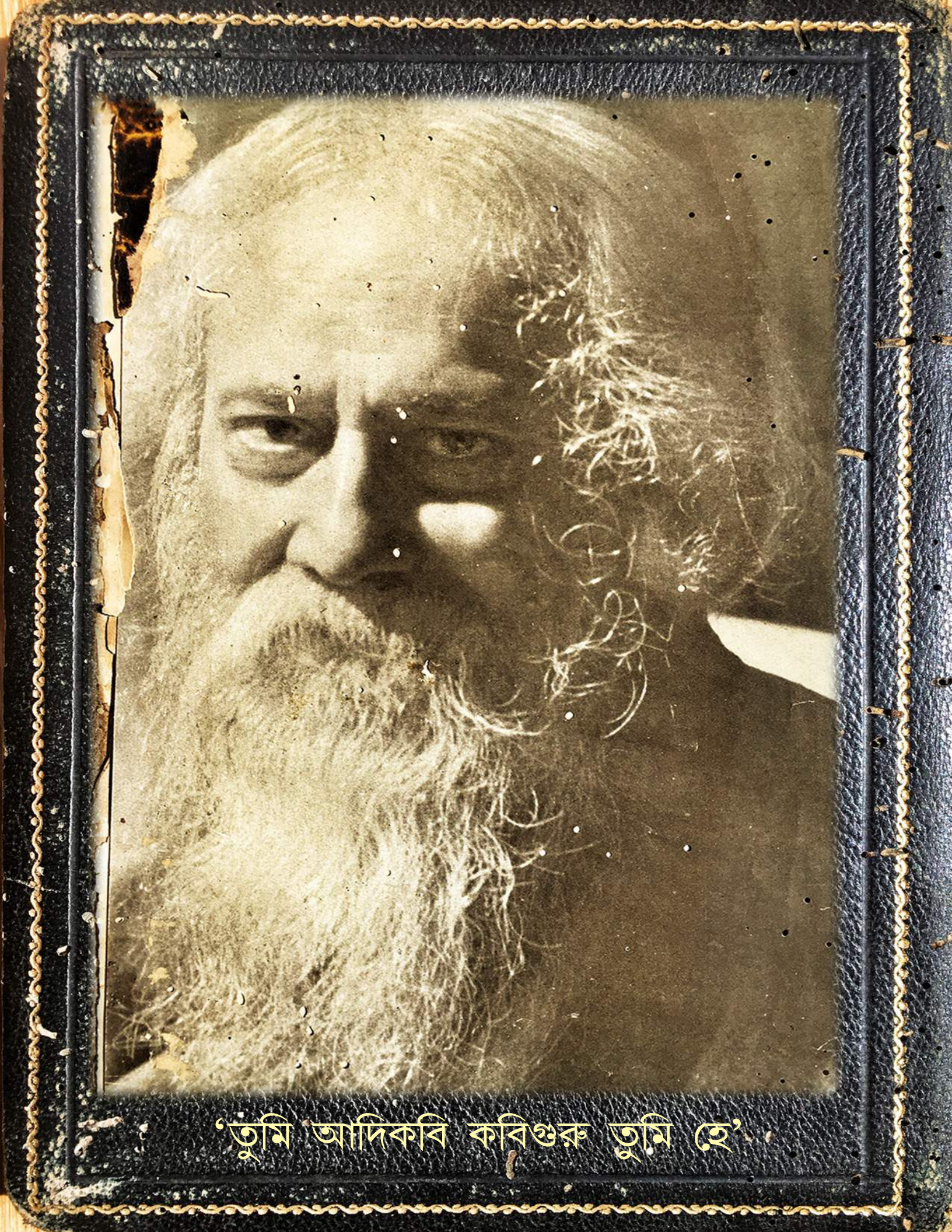

‘তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে’

বাতায়ন

Volume 21 : May, 2020

Editor : Ranjita Chattopadhyay

Volume 21 : May, 2020

ISBN: 978-0-6487688-1-4

Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)
Manas Ghosh, Kolkata, India

Coordinators, (Kolkata)

Manas Ghosh
Snehasis Bhattacharjee

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support

Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO

Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Front Cover, Title Page and Page 3 : Painting by Rabindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Inside Front Cover — Rabindranath Tagore Photo : From "BALAKA" 1st edition published by Indian Press, Allahabad, India in 1916.

Inside Back Cover & Back Cover — বিশেষ অংশ থেকে সংগ্রহীত – পৃষ্ঠা ১০৪ ও পৃষ্ঠা ৩০।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ের এক অমূল্য সম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষের কবিতা'র পাণ্ডুলিপি। কবির পরিণত বয়সের আশ্চর্য দৃষ্টিনন্দন এই পাণ্ডুলিপিটি। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি গদ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। যে কোনো রবীন্দ্রানুরাগীর পক্ষে এই পাণ্ডুলিপি এক দুর্লভ প্রাপ্তি। এই বইয়ের মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আঁকা বহুবর্ণের কয়েকটি চিত্রও। সংযোজিত হয়েছে তথ্যবহুল বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় এবং সংকলিত হয়েছে পাণ্ডুলিপি ও 'শেষের কবিতা'র প্রচলিত মুদ্রিত পাঠ মিলিয়ে পাঠান্তর।

সমগ্র বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ সবুজকলি সেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি মাত্র

গিরিনদী বালির মধ্যে
যাচ্ছে বেঁকে বেঁকে,
একটি ধারে স্বচ্ছ ধারায়
শীর্ণ রেখা এঁকে ।

মরু-পাহাড় দেশে
শুষ্ক বনের শেষে
ফিরেছিলাম দুই প্রহরে
দগ্ধ চরণতল ।
বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল ।

রৌদ্র তখন মাথার 'পরে
পায়ের তলায় মাটি
জলের তরে কেঁদে মরে
তৃষ্ণায় ফাটি-ফাটি ।

পাছে মুখের 'পরে
আকুল ঘ্রাণে নিইনে তাহার
শীতল পরিমল ।
রেখেছিলেম লুকিয়ে আমার
একটি আঙুর ফল ।
বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
নিশ্বাসিয়া উঠল হু-হু
ধু-ধু বালুর ডাঙা –
থাকতে দিনের আলো
ঘরে ফেরাই ভালো,
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল ।

শুকনো বনে ঘেরা শীর্ণ স্বচ্ছ পাহাড়ে নদীর দেশে কবি ভ্রমণে যান এক সময়ে । দগ্ধ দুপুর । সেই বনে কবি গাছের আঙ্গুর ফল দেখে একটা তুলে নেন তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে । তখনি খাননি । বেলা শেষে ফেরার পরে দেখেন আঙ্গুরটি শুকিয়ে গেছে । তৃষ্ণার্ত মানুষের মত প্রকৃতিও জীবন্ত । তারও তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, নিঃশব্দ জীবন আছে । তা অবহেলায় নয় ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতাগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে সংগ্রহীত । প্রকাশক পপুলার লাইব্রেরি ১৯৭৪ সাল ।

সম্পাদকীয়

"কল্যাণীয়াসু,

আমি এই খোলা নদীতে নির্জন চরের মধ্যে এসে ভারী আরাম বোধ করচি। বেশ বুঝতে পারছি একজন আছেন যিনি আমাদের সমুদয় বেসুরোকেই ধীরে ধীরে সুরে বেঁধে তুলছেন – জীবনের বীণাটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেই হল, আর কিছু নয়।"

১৮ই কার্তিক, ১৩১৮। ইংরাজী ৪ নভেম্বর, ১৯১১। এই চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে। জীবন বড় বেসুরে বাজছে আজ। সারা পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা। মন আশ্বাস খোঁজে। সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন – এই আশ্বাস। আমরা বাঙালীরা সৌভাগ্যবান। আমাদের বুকে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী জীবনে খোলা হাওয়া, তারার আলো, উদার আকাশের মতো শাশ্বত রবীন্দ্রনাথের রচনা।

বারে বারে তাই ফিরে যাওয়া সেই উদার, প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ডুব দেওয়া বাণী ও জীবনদর্শনের অতল গভীরে।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরার চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে আমাদের সামনে এখন। অদৃশ্য জীবাণুজাল ঘিরে ধরছে চারপাশ থেকে। চেনা বাস্তব পাল্টে যাচ্ছে এক লহমায়। স্বজনহারা মানুষ, পীড়িত, আর্ত মানুষ কিছুটা দিশাহীন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে বলবেন, "শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান।"?

জীবনের অবিরাম প্রবাহে করোনা সংক্রমণ, ঘূর্ণিঝড় 'এমফান' এক একটা তরঙ্গের মতো। এই মারের সাগর পার হতে হবে আমাদের। জীবনের এই ঘুলিয়ে ওঠা চেহারাটাই একমাত্র সত্যি নয়। এই বোধটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য আঁকড়ে ধরা রবীন্দ্রনাথকে। "প্রয়োজন বিচিত্র হলে তোমাদের চেষ্টার পথও বিচিত্র হবে, – নানাপ্রকার আঘাত আসবে, তারই দ্বারা তোমাদের সেবার চেষ্টা বিচিত্রভাবে উদ্বোধিত হয়ে উাবে এবং সেই সমস্ত বিঘ্নের সঙ্গে বারংবার সংগ্রাম করেই তোমাদের স্নেহ প্রতিদিন সবল ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।" আগামী দিনে নির্মল পৃথিবী গড়ে তোলার পথের সন্ধান তাঁর বাণীতে।

মে মাস বিশ্বজোড়া বাঙালীর কাছে পুণ্যামাস। কবিগুরুর জন্মমাস। এ বছর পঁচিশে বৈশাখ এর উদযাপন কিছু অন্যরকম হল। জীবাণু কাড়ছে জীবন। পাড়ায় পাড়ায় হয়নি রবীন্দ্রজয়ন্তী। চুপচাপ সব। তবে ঘরে ঘরে এ বৈশাখেও কবির ছবিতে পড়েছে মালা আর চন্দন। জ্বালা হয়েছে ধূপ। সেই সুবাসে বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে আমরা বলেছি, "কবি, আমরা ভাল

হয়ে যাব। তোমার কবিতা আছে আমাদের বুকে। দুনিয়াকে ছাড়ব না হাজারো অসুখে। যুদ্ধ করছি সব নিজের মতন। কিছুতেই হারব না আমরা স্বজন। ভালো হয়ে যাব কবি। ভালো হয়ে যাব। গীতাঞ্জলির দেশে পলাশ কুড়োব।"

অন্যান্য বারের মতো এবারেও "বাতায়ন" রবীন্দ্রসংখ্যা "বৈশাখী বাতায়ন" আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ দুর্যোগে জানালা খোলা রাখতে গেলে বাধা বিপত্তি আসেই। আপনাদের সকালের সহযোগিতায় ও "টিম বাতায়ন" এর পরিশ্রমে সেসব বাধা পার হওয়া সম্ভব হয়েছে। অনিবার্য কারণে কিছু দেরী হল এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে। আশা করি পাঠকেরা বুঝবেন সে কথা। এই বিপর্যয় আর দুর্যোগের মধ্যেও ভালোবেসে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যে সব কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার লেখা পাঠিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা ও শুভকামনা।

সকলে সুস্থ থাকবেন। ভাল থাকবেন। সকলকে ভাল রাখার চেষ্টায় আমাদের এই প্রয়াস বেঁচে থাকবে। ঝড়বাদলের আঁধার রাত পার হয়ে এগিয়ে চলবে নিজের মতো করে। আমাদের চলার পথের পাথেয় আপনাদের ভালোবাসা আর বন্ধুত্ব।

শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, বাতায়ন

সূচীপত্র

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

এমনই করে ঘুরিব দূরে বাহিরে 9

যশোধরা রায়চৌধুরী

রবি ঠাকুরের জন্য প্রেমপত্র 11

অর্পিতা চ্যাটার্জি

চিঠি 13

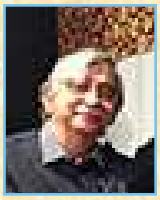

সিদ্ধার্থ দে

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য : কিছু আলোচনা 16

সুজয় দত্ত

আমার কবি 21

মানস ঘোষ

পুজোর ছলে 22

সুনন্দা বসু

আনন্দময়ী 23

ইন্দ্রাণী দত্ত

সদর স্ট্রীট জার্নাল 25

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর্জলি যাত্রা 31

শহিদুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথের গণতন্ত্র-ভাবনা 32

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের জীবনে আরও একটি বাইশে শ্রাবণ 35

সৌমিক ঘোষ

আমার সহজপাঠ 44

বিশ্বদ্বীপ চক্রবর্তী

আমার গানের ওপারে 45

শুভ্র দাস

আমার রবীন্দ্রনাথ 47

দেবীপ্রিয়া রায়

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু মন 50

শাশ্বতী বসু

সঞ্জীবনী 61

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

ভিখারিনি আর কাবুলিওয়ালা 54

স্বর্ভানু সান্যাল

শান্তি নিকেতন 66

সঞ্জয় চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে 55

মনীষা বসু

মধ্যবর্তিনীর চরিত্ররা 70

সৌমিত্র চক্রবর্তী

বাঙালির ঠাকুর পুজো 56

তপনজ্যোতি মিত্র

বিভাসপূরবীর কবিতা 57

এক অমলের কাহিনী 74

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

রবিরশ্মি 57

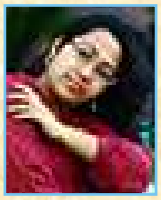

শ্রেয়সী দাস

রবীন্দ্রনৃত্য – এক অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্য শৈলী 76

অমৃতা মুখার্জী

শিক্ষক 58

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আমার কণ্ঠ হতে 77

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

এমনই করে ঘুরিব দূরে বাহিরে

‘পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য। অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর,
বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য। অর্থাৎ সমস্তটার খবর।’

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ একবার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন যে সমুদ্রকে দেখে তাঁর রক্তে দোলা লাগে, এবার সমুদ্রের যদি না লাগে তবে তার দায় রবীন্দ্রনাথের হতে পারে না। পড়তে পড়তে মনে হয়, সারাজীবন বিশ্বকবি যেন এক সমুদ্র থেকে অন্য এক সমুদ্রের দিকে ছুটে গিয়েছেন। আর সেই সমুদ্র কেবল প্রাকৃতিক নয়, তা জনসমুদ্রও। তাঁর লেখায় কথায় যাপনে বারবার আমরা দেখতে পাই সেই আয়নাকে, দাঁড়িয়ে থাকলে নিজের মুখও যাতে আবছা দেখায়। আর পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ালে যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানুষের মুখছবি।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক শিবিরে যে বাঙালি লেখকরা গিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই কখনও না কখনও মনে পড়েছে যে রবীন্দ্রনাথ একদিন এখানে এসেছিলেন। চড়ামাত্রার প্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। তবু সেই সময়ও আমেরিকাতে তাঁকে ঘিরে অনেক ভিড়। যে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণের সময় সর্বদা একলা কামরায় চলাফেরা করা পছন্দ করতেন, ওই ভিড় তাঁর কেমন লাগত ? কেমন যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ভক্ত পাঠকদেরও একটু দূর থেকে অনুভবে পেতে চাইতেন। ঢেউয়ের গায়ে আছড়ে পড়া তার না-পসন্দ ছিল।

আমেরিকায় বিশেষ করে একটা জিনিস তাঁকে অবাক করেছিল। তিনি টের পেয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য মনের অভ্যাস এমনই যে সে দেশের লোকেরা নিজেদের অভ্যাসের চেয়ে পৃথক কিছুকে – তা সে বহিরঙ্গেরই হোক বা আত্মিকই হোক, একেবারে বুঝতেই পারে না। এই উপলব্ধির পিছনে রবীন্দ্রনাথের অনেক অভিজ্ঞতা কাজ করেছে নিশ্চয়ই, তার মধ্যে একটির কথা বলাই যায়। একবার রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার এক সমুদ্র সৈকতে বসে আছেন তখন এক বেয়ারা লোক এসে তাঁর পোশাকের একটা অংশ তুলে ধরে প্রশ্ন করেছিলঃ ‘Hey, what is this ! Is this a kind of a bathrobe?’ এই অভব্যতা সম্পর্কে পরে তিনি বলেছিলেন, “এ বিদ্রূপের কারণ শুধু এই যে আমি এমন পোশাক পরেছি যা বিদেশি। যদিও তা কোনও অংশেই শালীনতা, সৌন্দর্যে এ দেশের পুরুষের পোশাকের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। এবং তাতে লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণই নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যেকোনও বিদেশি একপ্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারে, সে বিদেশি বলেই তাকে কেউ অসম্মান করতে পারে না। সে যে সেই দেশের অভ্যাস ও আচারব্যবহার জানে না সেইজন্য বিদ্রূপের ভাগি হয় না। কেউ আশাই করে না যে সে সব জানবে ... Santa Barbara – তে আমাকে দেখে মেয়েরা হাসাহাসি করেছিল – কিন্তু সেই মেয়েদের সৌন্দর্য লাবণ্য ও স্বচ্ছন্দ জড়তাহীন চলনভঙ্গিমার আমি প্রশংসা করেছি।”

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় আমেরিকার কাগজেও যখন রবীন্দ্রনাথের চেহারার সঙ্গে যীশুর সাদৃশ্যের কথা লেখা হচ্ছে তখনও রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের ভাব গোপন না করে স্পষ্টই পশ্চিমের হুড়োতাড়ার বিরুদ্ধে মত রাখছেন, “আমি এই দৌড়োদৌড়ি দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি – তোমাদের এ কি অমানুষিক ব্যাপার। এ যেন ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি আর অর্থ উপার্জনেরই দেশ।”

হয়তো এর বাইরেও একটা আমেরিকা তার আদিগন্ত বিস্তৃত ভুট্টাক্ষেতে, তার নদীতে, পাহাড়ে জেগে আছে। তবু সেখানে তিনি তা পাননি যা প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ তাকে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “ আমি জাপানে দেখেছি সাধারণ মজুররাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট ধরে স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্ন হয়ে আছে, তাদের কালো চোখের দৃষ্টি সুরে কোমল, এই দৃশ্যের সঙ্গে লণ্ডন শহরের দৃশ্যের তুলনা করেছি, জনতা ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাস, তাদের মুখ উদভ্রান্ত।”

জাপানি সঙ্গীতের দৈন্য সম্পর্কে অন্যত্র মন্তব্য করলেও জাপানিদের এই শিল্পবোধ আর সৌন্দয্যবোধ কবিকে অপরিসীম তৃপ্তি দিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপও কি প্রবল ভালোবাসে নি রবীন্দ্রনাথকে? রটেনস্টাইন, বার্ণাড শ'কে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন, "আমি চাই তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখো, কারণ তুমি তো এ জীবনে বেশী সাধুও দেখো নি। কবিও কমই দেখেছ ..... ভারতের যদি এমন প্রতিনিধি আর নাও থাকে তবু এরই জন্য ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেশ বলে আমাদের গণ্য করা উচিত।" এ তো গেল মনীষীদের কথা, কিন্তু ইউরোপ জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কী অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা ছিল তা এখন জানলে বিস্ময় জাগে।

কবির প্রতি ভালবাসায় বোধহয় অন্যসব দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল জার্মানি। ভিয়েনাতে, কোলোনে সহস্র লোক সমবেত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে। না, হুজুগের ভিড় ছিল না সেটা। রয়টার খবর করছে যে, পাঁচ-ছ'হাজার লোক আধক্রাউন থেকে দশ শিলিং পর্যন্ত মাথাপিছু খরচ করে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় কবি তাঁর কবিতা পড়েছিলেন বাংলায় এবং তা অনুদিত হয়েছিল জার্মানে। মানুষের প্রবল ভালবাসা পেয়েছিল সেই কবিতারাও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা জার্মান অনুবাদে আদৌ শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে কিনা তাই নিয়ে বক্রোক্তি করেছিল ব্রিটিশ শাসনের ধ্বজাধারী সেই সময়ের স্টেটসম্যান। কিন্তু সত্যকে বদলানোর সাধ্য তার ছিল না।

কেবল জার্মানি নয়, চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রামে গ্রামে অভিনীত হত ডাকঘর আর সেখানে মূল চরিত্রগুলোয় অভিনয় করত মেয়েরাই। মানুষের ভিড়ে দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যেতো না সেখানে। লণ্ডনের একটি কাগজে 'জার্মানি কী পড়ছে' এই নামের প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, ভারতবর্ষের কবির বই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়। একই ব্যাপার ঘটছিল রাশিয়াতেও। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ পাওয়া মাত্রই লক্ষ পাঠক তা সংগ্রহ করছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় আমাদের পরিচয় হয়েছে এক আশ্চর্য নারীর সঙ্গে, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভাইজি লিলি ফ্রয়েড। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণের সময় তিনি কবির কাছে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছিলেন। এবং কোনও কোনও জায়গায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন। ১৯৫৩ সালে লন্ডনে আলাপ হওয়ার মুহূর্তে মৈত্রেয়ী দেবী যখন খবরটি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না সেই দোলাচলে ভুগছেন তখন শুভ্রকেশা লিলি তিরিশ বছর আগে আয়ত্ত করা 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' নির্ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে উপস্থিত বাঙালিদের আপ্লুত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিবিধ বিষয়ে পাশ্চাত্যের কঠোর সমালোচক হয়েও এই ভালবাসার টানে ভেসে যাচ্ছেন, মনে করছেন যে তাঁর জীবনের শেষদিনগুলোর ওপরে পাশ্চাত্যের অধিকার রয়েছে তখন দেশের ভিতরেই গণ্যমান্য কিছু রাজনীতিবিদ তাঁকে কুৎসিত আক্রমণ করছেন; নাইটহুড এবং নোবেলের বিনিময়ে তিনি পশ্চিমের কাছে বিকিয়ে গেছেন, এমন কথাও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই সময়েই জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড পরিত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ। লর্ড চেমসফোর্ডকে চিঠি লিখে ওই খেতাব ফিরিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথই পরে বলেছেন, "আমার এত অহংকার নেই যে সাহিত্যিক কাজের জন্য আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, অভদ্রতা করে তার প্রতি কপট ঘৃণার ভাব দেখাবো। আমি জনসমক্ষে এমন কোনও কাজই করতে চাই না, যাতে এতটুকু নাটকীয়তা ঘটে। কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে আমাকে দায়ে পড়েই তা করতে হয়েছে যখন কিছুতেই কোনও রাষ্ট্রনেতাকে দিয়ে পাঞ্জাবে যে ঘটনা ঘটেছিল তার উপযুক্ত প্রতিবাদ করাতে পারলাম না।"

বিশ্বপথিক বলেই কি রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি করে ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ? সারা পৃথিবীর সুর তাঁর কানে বাজত বলেই কি দেশমাতৃকার কান্না সবচেয়ে বেশি করে অনুভব করতেন ।

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯৭৫, কলকাতায়। শিক্ষা : ইংরেজি সাহিত্যে এম এ। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় সাউথ পয়েন্ট স্কুল ম্যাগাজিনে। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৯৫-এ। কবিতার বই প্রথম প্রকাশিত ২০০০ সালে। পেয়েছেন কৃত্তিবাস পুরস্কার। গদ্য লেখালেখির শুরু 'উনিশ কুড়ি' পত্রিকায়। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ২০০৩-এ। প্রথম উপন্যাস 'সোহাগিনীর সঙ্গে এক বছর' প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' ২০০৭-এ। কর্মজীবন শুরু টিউশনি দিয়ে। চিত্রনাট্য লিখেছেন টিভি সিরিয়াল ও সিনেমার। বর্তমান পেশা শিক্ষকতা। ঠাকুর শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের শিষ্য। পড়তে ভালবাসেন ইতিহাস, থ্রিলার ও ধর্মগ্রন্থ। শখ : ট্যাক্সি চড়া।

যশোধরা রায়চৌধুরী

রবি ঠাকুরের জন্য প্রেমপত্র

বাবু রবি ঠাকুর,
সমীপেষু

(১)

(যখন ভাঙল মিলনমেলা ভাঙল . . .)
আপনাকে দেখেছি আমি বহুদিন ধরে
লন্ডনে বিষণ্ন সন্ধে, পিয়ানোর টুংটাং মৃদু
বসবার ঘরটিতে আগুন পোহানো
চেয়ারের মসৃণ কাঠের হাতলে
ভারি মাফলারখানি খুলে রেখে হালকা স্বেদের রেখাগুলি
মুখময় লাবণ্য আনত । আপনি কি ঘামতেন
উল্টোদিকে আমাকেই দেখে ?
মসলিন গাউনের ভেতরের হৃদয়ের ধুকুপুকুখানি
আপনি কি জানতেন, না জানলেও চলে যেত তবু
অনেক স্কটিশ গান, ব্যালাডে উচ্ছল সুরারোপে
গুণগুণ সুর ভেঁজে আপনি যে লিখে রাখতেন সেই নোটেশনগুলি
সমৃদ্ধ হবেন বলে, সমৃদ্ধ করবেন বলে পৃথিবীকে, বাঙালি জাতিকে

আপনার হঠাৎ চলে যাওয়া
আমাকে বিপন্ন করল, সূচীমুখ ব্যথা দিল বটে
কিন্তু না-ভোলাখানি আমি তুলে রেখে দিয়েছিনু
গোটানো কার্পেটটুকরো, অনেক রঙ্গিন উল, সূচের ফোঁড়ের সঙ্গে,
আমার গোপন চেস্টে, আখরোট কাঠের ।

আবার কখনো যদি দেখা হয়ে যায় রবিবাবু ?
(হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না যে . . .)

(২)

(এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে !)
পেনেটির বাগানবাড়িতে, সেই গঙ্গার ধারটিতে একাকী তন্ময়
দেখেছি আপনাকে আমি জোড়াসাঁকো-ছাতে
দেখেছি আড়াল থেকে দু বিণুনি মেয়ের মতন
গান বাঁধছেন আপনি, সুর নিয়ে খেলছেন কত
পায়ে পায়ে কাছে এসে কথা বলব, সাহস হলনা কোনদিন
আপনাকে শুনেছি আমি বারে বারে আপনার প্রাণকাড়া গানে
আমার যৌবনে
আমারও অর্গ্যান ছিল, রবিবাবু, আমারও গানের গলা ছিল
ব্রাহ্ম ভাবধারাখানি আমারও শ্বশুরকুলে ছিল
শ্বশুর মশাই তাঁর আরাম কেদারাতে বসে দু চক্ষু মুদিয়ে
শুনতেন আমার গান, সে গান তো আপনারই, শুধু
(আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মত . . .)

শেষবার আপনাকে গাই আমার স্বামীর মৃত্যুকালে
আশি পেরনোর পর কাঁপা কাঁপা গলাটি আমার
(মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও . . .)
আমার স্বামীর হাত এগিয়ে এসেছে
(হাতখানি ওই বাড়িয়ে ধরো দাও গো আমার হাতে . . .)
আমি অশ্রুহীন, শান্ত, তাঁর শিরাওঠা হাত তুলে নিয়ে হৃদয়ে চেপেছি . . . ।

(৩)

(দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেও নাকো ফিরে . . .)

আর এখন, রবিবাবু, আমি আজো আপনাকে পাই
ফিউশনে আইপডে ডিস্কে চটুল . . .

শুধু ওই প্রেম ভেঙে ভেঙে গিয়েছিল যখন আমার
বারে বারে একটা ব্রেক আপ থেকে আর একটা ব্রেক আপে
আপনার গান দিয়ে ক্ষতগুলি মুড়িয়ে রেখেছি . . .

(আমি এলেম তারি দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে . . .)
আমি আজো জানি রবি, কমিউনিকেশন হয়না, তবু, চেষ্টা করে যেতে হয়
মুহুর্মূহু কমিউনিকেশনের তরে . . .

যশোধরা রায়চৌধুরী — বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি এবং গল্পকার। তার লেখা তেরোটি কাব্য আর ছয়টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখার জন্য ১৯৯৮ সালে কৃত্তিবাস পুরস্কার ও বাংলা অ্যাকাডেমীর অনিতা সুনীলকুমার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তার গল্প ও কবিতার বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — পণ্যসংহিতা, পিশাচিনি কাব্য চিরন্তন গল্পমালা, মাতৃভূমি বাম্পার, ভবদেহে স্বর্গীয় সঙ্গীত ইত্যাদি। যশোধরা ফরাসী থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করেছেন।

অর্পিতা চ্যাটার্জি

চিঠি

মাস-দেড় দুই আগের কথা বোধহয়, তখনও বিপদ এসে বাসা বাঁধেনি মাথার উপর। অন্যের বিপদ দেখলে ভয় হয়, চিন্তা হয়। আতঙ্ক বোধহয় হয়না। কারণ বিপদটা অন্যের। জিমে ছিলাম কাকভোরে। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শরীরটাকে সচল করার চেষ্টায় আছি। সামনে টিভির খবরে কেবলই মহামারী আর মৃত্যুর সচল সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। প্রায় সবই ইউরোপ এবং চীনের খবর তখন। সাতসকালে পরিবেশিত সংবাদে জীবন না থাকলে সে সংবাদ চট করে কানে ঢোকে না আমার। আর আজকাল সংবাদ মানেই যেহেতু দুঃসংবাদ, তাই প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা ওদিক পানে পা না রাখারই চেষ্টা করি। সেদিনও কান ছিল অন্যকিছুতে। একটি অডিওবুক। 'শ্রুতিগ্রন্থ' বলি যদি বেশ লাগে তাই না ? তা সে যাই হোক, কানের মধ্যে দিয়ে ফের পড়ে নিচ্ছিলাম সেদিন 'ন হন্যতে।' সেদিন পড়ছিলাম বললে ভুল হবে। বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে শুনছিলাম। ল্যাবে হাতের কাজ সারতে সারতে, রান্না করতে করতে, বাসন ধুতে ধুতে, আবার সেদিন যেমন জিমে গা ঘামাতে ঘামাতেও। একটু অবাক লাগছে হয়তো তাই না ? জিমে মানুষ দ্রুতলয়ের উচ্চকিত সুরে অভ্যস্ত। আমার কান বা মস্তিষ্কের বোধহয় এ বোধ খানিক কম। আমার কীর্তন শুনতে শুনতে গা ঘামাতেও অসুবিধা হয়না বিশেষ। যা শোনা হয়নি, অথচ শুনতে খুব ইচ্ছে করছে এবং সে মূহুর্তে আর অন্যদিকে কান বা মাথা দেবার তেমন একটা প্রয়োজন নেই, সেরকম সময়ে যেকোনো কিছুই শুনতে আমার অসুবিধা হয়না।

কিন্তু সেদিনের সেই ন হন্যতে-র পাঠ শুনতে শুনতে কেবলই হাত পা শিথিল হয়ে আসছিলো। পাঠিকা পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি। তিনি লিখছেন তাঁর স্নেহের অমৃতাকে।

"…. জীবনের পরিণতি একান্ত স্মৃতির মধ্যে দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বেদনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে, কঠোরকে ললিতে, অম্লতাকে মাধুর্য্যে পরিপক্ক করে তোলাই হলো পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে তা আমি মনে করিনে। কারণ, তোমার কল্পনাশক্তি আছে। এই শক্তি সৃষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে নিষ্ক্রিয় ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না। নিজেকে পূর্ণতর করে তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। আমি জানি আমাদের দেশের পক্ষে উদারশক্তিকে আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। বাইরের দিকের প্রসারতার ক্ষেত্র তাদের অবরুদ্ধ। অন্তর্লোকের প্রবেশের যে সাধনা সে সম্বন্ধেও আনুকূল্য তাদের দূর্লভ। তুমি হতাশ হয়োনা। নিজের ওপর শ্রদ্ধা রেখো। চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ করো, যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করে। তোমার পীড়িত চিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত, আমি চেষ্টা করতুম। কিন্তু একান্ত মনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিচ্ছু করার নেই। যদি বাইরে কোনো ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো।"

সেই কোন ১৩৩৭ সালে কোনো এক নিভৃতচারিনী মননশীল স্নেহাস্পদাকে লিখেছিলেন বৃদ্ধ এক কবি। আর এই ১৪২৭ বঙ্গাব্দে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে আর একজন নারীকে স্থবির করে দিল সেদিন সেই একই চিঠি। মনে মনে হিংসা হতে লাগলো। আমি যদি কাউকে ভরসা করে আমার মনের নিভৃত অপূর্ণতাটুকু নিবেদন করি, আমার এত বছরের জীবনেও এমন কি কেউ আছে যে আমায় এমন করে সে লেখার উত্তর দেবে ? এমন করে লেখার অক্ষর দিয়ে মনের পাথর সরিয়ে দেবে? ক্ষতের উপশম তো চাইনি কোনোদিন। সে তো আমার নিজের কাজ। কিন্তু তবুও এমন একজন মানুষকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে যিনি দূর থেকে হলেও সে ক্ষত যে বাইরের, সে ক্ষত যে কত 'ক্ষুদ্র' সেটুকু মনে করিয়ে দেবেন।

তাতে ক্ষত আপনা থেকেই সেরে উঠতে উৎসাহ পাবে। দুকলম চিঠিতে কেউ যদি আমায় লিখতো, "তোমার পীড়িত চিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত, আমি চেষ্টা করতুম। কিন্তু একান্ত মনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিচ্ছু করার নেই।" তাহলেও বর্তে যেতুম পরের লাইনটি পড়ে।

"যদি বাইরে কোনো ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো।" আহঃ, ঈশ্বর যদি নিজে আসতেন আমার নিভৃত রাতের বন্ধু হয়ে তিনিও কি এর চাইতে অধিক কিছু বলতেন আমায় !

যা কিছু আমায় পীড়ন করে, যা কিছু আমায় "নিজেকে পূর্ণতর করে সৃষ্টি" করার পথে বিপুল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যা কিছু আমার "বাইরের প্রসারতার" এবং "অন্তর্লোকের প্রবেশের সাধনা"-র পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আমাকেই ক্ষুদ্র বলে নিরন্তর পরিহাস করে চলে প্রতিনিয়ত, সেই সব কিছুকে এই একটি বাক্যে যদি কেউ আমার মন থেকে মুছিয়ে দিতে পারত ! আমি নিশ্চিন্তে নতুন জন্ম নিতুম। এসব কিছুই যে শুধু বাইরের, এসব কিছুই যে শুধু ক্ষুদ্রতা তাই নয়, এর কাছে "পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো।" সত্যি বলছি, একথা কেউ আমায় লিখলে আমি একশ রাতের একলা কান্না ফেলে উঠে ভোররাতে স্নান সেরে চিবুক উঁচু করে যুদ্ধে যেতে পারি।

অন্তর্মুখী মানুষদের বিপদ বিষম। তারা না পারে নিজের মনের সঠিক অবস্থান সামনের কাউকে বুঝিয়ে বলতে, না পারে প্রিয় মানুষদের থেকে পাওয়া নির্মমতাকে অতিক্রম করে নিজের নিভৃতচারণের পথে একলা এগিয়ে যেতে। এমতাবস্থায় অন্তর্মুখী মানুষদের নিজেদের মনের বাইরের পরিসরে প্রতিদিনের রাত্রিদিনে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো, অভ্যাসের দিনযাপন আর তার সাথে ক্রমাগতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে আত্মমর্যাদার শেষ তলানিতে এসে পৌঁছানো। তাঁদের প্রত্যেকেরই যদি এমন একজন 'কবি' থাকতেন যিনি মনে করিয়ে দিতেন, "নিজের ওপর শ্রদ্ধা রেখো। চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ করো, যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করে।" তবে কি সমস্ত বাইরের ক্ষুদ্রতাটুকু পার হয়ে এসে নতুন করে আর একটি সৃষ্টিশীল মানুষ জন্ম নিতো না ?

এখানেই কবির 'অমৃতা' জিতে গেছেন। অন্তর্মুখী অথচ সৃষ্টিশীল একজন মানুষ। তাই পারিপার্শ্ব তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে ছাড়েনি। তবুও এমনই একেকটি চিঠি যাঁকে সমস্ত পার্থিব ক্ষুদ্রতা থেকে বের করে এনে বড় হয়ে উঠতে, সৃষ্টিকর্মেই নিজের ঈশ্বরকে খুঁজে নিতে শিখিয়েছিলো। যা সেদিনের সেই কাকভোরে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আধুনিক জিমের এককোণে গা ঘামাতে থাকা আজকের মেয়েটির কাছে ছিল না। চরম এক অপাঙতেয় মনে হয়েছিল নিজেকে যার সঠিকভাবে ছাত্রী বা শিষ্যা হবার যোগ্যতাটুকুও বুঝি নেই। যাকে এমন চিঠি কেউ কোনোদিন লিখবে না। এমন করেই নানান লেখা থেকে, ছাপার অক্ষর থেকে, রেকর্ডেড অডিও থেকে খুঁটে খুঁটে তাকে জুগিয়ে চলতে হবে নিজেকে ঠেলে তোলার রসদ। এখনো বহুদিন। বিপদে উৎরে দেওয়ার প্রার্থনা যে কোনোদিন করেনি, চেয়েছে শুধু নির্ভয় থাকতে, নিজের শক্তির সঠিক সময়ে সঠিক প্রয়োগ করতে, তারও তো হতাশার দিনে সামনে ঋজু একজনকে দেখতে পেতে ইচ্ছে করে। একজন ব্যক্তিমানুষ। তাঁকে ঈশ্বর বলে ভেবে নিঃসংশয়ে বিপদের মাঝে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তাঁকে দেখে নিজের জীবনকে ঈশ্বরসম করে গড়ে তুলতে ইচ্ছে করে। সে মেয়ে জানে এ নিতান্তই কষ্টকল্পনা। তবুও সেই আবছা ভোরের আলোয় আধুনিককালের এক নারীর মনে সেদিন প্রবল ঈর্ষা জেগেছিলো প্রায় একশ বছর আগেকার এক নারীর অন্ততঃ এই একটি সৌভাগ্যকে মনে করে।

এতবছর আগের লেখা একটি চিঠির কতগুলি লাইন, সেই একশো বছর আগেকার একনারীর মনেও যে পূর্ণতা এনেছিলো, পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে, চতুর্পার্শ্বে সম্পূর্ণ কেজো, কঠিন এক পরিবেশেও, অদ্ভুত এক উচ্চগ্রামের সুর থাকা স্বত্বেও, আজকের সেই অকিঞ্চিৎকর, কোথাও-না-থাকা সেই মেয়েটির মনে যে স্থিরতা এনেছিল, তাকে বোধহয় একাসনে

বসানোই চলে। আর সেখানেই সেদিনের সেই বৃদ্ধ মানুষটির প্রাসঙ্গিকতা। যিনি কবি প্রাবন্ধিক, সুরকার, লেখক, দার্শনিক আর যা খুশিই হন না কেন, সব ছাপিয়ে তিনি যে সংবেদনশীল স্নেহাস্পদের মনের সঠিক হদিশ রাখা একজন ঈশ্বরসম পথপ্রদর্শক, এ পরিচয় মস্ত হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীব্যাপী আসন্ন বিপদ, নিজের ক্ষুদ্র জীবনের অপূর্ণতা, অনিশ্চয়তা, পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত অযাচিত অপমান, এ সমস্তই "বাইরের", এ সমস্তই "ক্ষুদ্র" হয়ে দাঁড়ায়। সমস্তকে ম্লান করে কানে বাজতে থাকে, "চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ করো, যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করে।"

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

"বিপ্লবের রেশ তখনও পুরো কাটে নি,
বাইরের পরিবেশে চাপা উত্তেজনা।
সকাল হল। জনতা হামলে পড়েছে।
সকলকে অবাক করে প্রথম রোদ্দুরে
সুঠাম সৌম্যদেহ কবি দাঁড়ালেন বারান্দায়।
জানালেন তিনি কবিমাত্র, অন্য কিছু নয়
যেন এক অলৌকিক প্রভাবে মুগ্ধ জনতা।"

বিপ্লবের দেশে / তন্ময় চক্রবর্তী (আমার রবিঠাকুর)

সিদ্ধার্থ দে

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য : কিছু আলোচনা

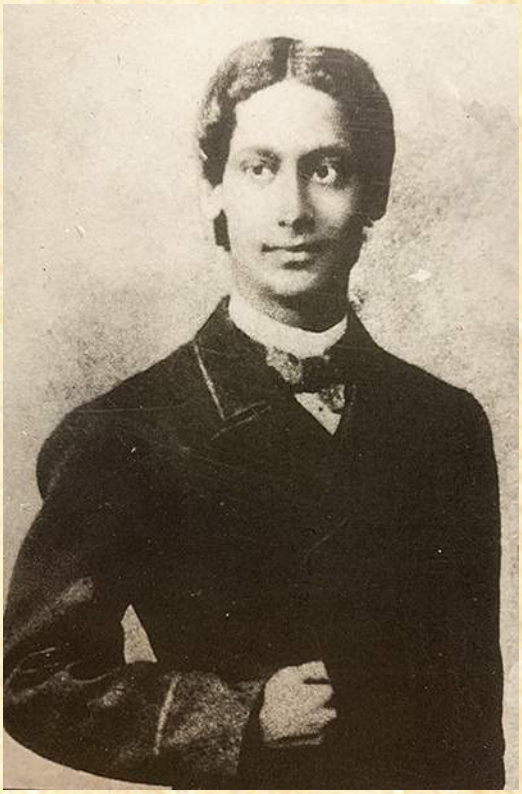

সত্তরের দশকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময়ে সাহিত্যচর্চা মাথায় উঠেছিল। সাহিত্যপাঠের প্রতি কিছুটা নেতিবাচক মনোভাবও মাথা চাড়া দিয়েছিল।

এক কলকাতায় জন্ম এবং বড় হওয়া দক্ষিণ ভারতীয় সহপাঠী একদিন মন্তব্য করল "যাই বল না কেন, তোরা বাঙালিরা টেগোরকে নিয়ে একটু বেশীই আদিখ্যেতা করিস।" একটু রাগ ধরলেও সেরকমভাবে বিতর্কে যাইনি। ট্যাঁশ স্কুলে এবং খড়্গপুর আই আই টির সর্বভারতীয় পরিবেশে পড়াশুনা কপার কারণে কিছুটা সহমতও ছিলাম। তবে বলতেই হবে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে ইঞ্জিনিয়ারদের ইঁট কাঠ লোহা সিমেন্টে ভরা জীবন বড়ই রসকসহীন ! সে জগতে টেগোরেরও প্রবেশ করা সহজ ছিল না।

তবে যতই অস্বীকার করি না কেন, রবীন্দ্রনাথ গড়পড়তা বাঙালির DNA তে ঢুকে গেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই। ফেসবুকে একটা ছবি দিয়ে কেউ পোস্ট করেছেন "Caption Please !"

ছবিটা বেশ মজার – এক সিংহ মুখে করে সিংহীর ল্যাজটা ধরে আছে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে মাথায় এলো "আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, ল্যাজের বাঁধনে ..." ।

লিবিয়াতে কারখানায় কাজ করার সময়ে নরহরি নামে এক তেলেগু ফোরম্যান আমার অধীনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ঘরে ঢুকলেই অবধারিত ভাবে মনে মনে সুর ভাঁজতাম "আয় তবে নরহরি ..." (মূল গান "আয় তবে সহচরী ...") । রবি ঠাকুর লিবিয়ার মত বর্বর দেশেও ধাওয়া করেছিলেন।

সম্প্রতি এক ভাঁড় বেসুরো গলায় কিছু জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অতি অশ্লীল প্যারডি গেয়ে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। একটাই প্রশ্ন : এত গান থাকতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে টানাটানি কেন ? এক কথায় ব্যাপারটা হল শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হলেও ওনার হাত ধরতে হয় ! রবি বিনা গীত হয়না !

ছ্যাবলামো হল। বুড়ো বয়সেও এই স্বভাব যায়নি। অবশ্য খোদ রবীন্দ্রনাথই তো বলে গেছেন :

"এত বুড়ো কোনদিনও হব না কো আমি, হাসি ঠাট্টারে তবে কব ছ্যাবলামি।"

১৯৯২ সালে একবার সিডনিতে সম্প্রতি প্রয়াত ফুটবল তারকা চুনী গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কথায় কথায় প্রশ্ন রেখেছিলাম "আপনার জীবনের অনুপ্রেরণা কি ?" বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সুদর্শন মহাতারকা উত্তর দিয়েছিলেন "রবীন্দ্রনাথ। উনি আমার সঙ্গে শয়নে স্বপনে জাগরণে আছেন।"

সেই সময়ে নতুন দেশে থিতু হবার চেষ্টা করছি। মন্তব্যটা সেইভাবে ছুঁয়ে যায় নি। জীবনের priority তখন অন্য।

তারপর প্রায় তিন দশক কেটে গেল। জীবনের গোধূলিবেলায় পৌঁছে গেছি। অবসর জীবনে অফুরন্ত সময়।

বইয়ের তাকে রাখা পনেরো খণ্ডের রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে থেকেই পড়ি। পৃথিবীতে অনেক সাগর, উপসাগর। ভূমধ্যসাগর, বঙ্গোপসাগর, অতলান্তিক, আরব সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর – সব কটির তীরেই বসেছি জীবনের কোন না কোন সময়ে । প্রতিটি সাগরেরই বিশালত্বের মাঝে স্বতন্ত্র চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধারার লেখার সঙ্গে উপরোক্ত সাগরগুলির স্বতন্ত্র চরিত্রের মিল পাই। আশ্চর্য হতে হয় ওনার বহুমুখী প্রতিভা দেখে। এক দিকে কালজয়ী কবিতা ও গান, অন্যদিকে মুগ্ধ করা গল্প উপন্যাস নাটক। এছাড়া নানা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ – ব্যাপ্তি অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা , বিজ্ঞান, দর্শন, ভ্রমণ, রাজনীতি।

কবিতা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু পড়তে সেভাবে শিখিনি। খামতিটা কবিগুরুর নয়,এই অধমের। তাও চেষ্টা করি রসোপলব্ধি করার ।

সুনীল শীর্ষেন্দুর মত ওনার লেখা একদমে পড়ে ফেলা যায়না। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যই ভাবায় – অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে হয়। তাই নিশ্চিত নই বাকী জীবনে পনেরো খণ্ডের সব লেখা পড়ে উঠতে পারব কিনা।

****

বেশ কিছু লেখা পড়েছি গত কয়েক বছরে। কিছু আগে পড়া, অধিকাংশই যৌবনকালে পড়ার সুযোগ হয়নি। আক্ষেপ অবশ্য নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথের লেখার রসোপলব্ধি করার মত মনের পরিপক্কতা সেই কাঁচা বয়সে ছিল না। মানবজীবনের অনেক উপলব্ধিই কৈশোর যৌবনে অধরা থেকে যায়।

লেখার বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে একটা ধারা নিয়ে সম্প্রতি মজে আছি। সেটি হল ওনার ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখাগুলি। এগুলিকে ভ্রমণ কাহিনী না বলে ভ্রমণ সাহিত্য বলাই ভাল। ভ্রমণ কাহিনী বলতে আমরা travelogue জাতীয় লেখাই বুঝি যেগুলিতে লেখক ব্যক্তিগত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। লেখাগুলি সাধারণত তথ্যসমৃদ্ধ হয়, ভ্রমণপিপাসুদের পড়তে ভালই লাগে। যেমন কেউ তাজমহল বা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে গিয়ে স্হাপত্যগুলির ইতিহাস ব্যক্ত করলেন। এর উপর ভাষার মুন্সীয়ানা, উপস্থাপনার বাঁধুনি এবং সৌন্দর্য, মানুষজনের কথা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি যুক্ত হলে লেখাগুলি ভ্রমণ সাহিত্যর স্তরে উন্নীত হয়। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রীর ডায়রী, ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ।

মূলত একটি লেখার বিষয়েই আলোচনা করব এই নিবন্ধে – 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। ১৮৭৮ সালে বিলেত যাত্রা থেকে ১৯৩২ সাল অবধি উনি পৃথিবীর ৩৪ টি দেশে সফর করেছেন। ইংলন্ড ও আমেরিকা বাদে দেশগুলি হল ফ্রান্স, হংকং, চীন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, ইতালি, নরওয়ে, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, মিশর, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, বার্মা, হল্যান্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ইরান, ইরাক ও শ্রীলংকা।

মানে হল নতুন পৃথিবীর ওশেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যান্ড, পাপুয়া নিউ গিনি ইত্যাদি দেশগুলি) বাদ দিয়ে নতুন এবং পুরনো পৃথিবীর সব কটি মহাদেশেই পা রেখেছেন। চটজলদি হিসেব করে দেখলাম যাত্রার সময় ধরে আশি বছরের জীবনের ছ'সাত বছর কেটেছে বিদেশে। এই ভ্রমণে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বহু বিদ্বজন, রাজা রাজরা, রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বিস্তর বক্তৃতা দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা জেনেছেন। বলাই বাহুল্য, এই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং লেখনীকে প্রভাবিত করেছে। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখাগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক লেখাতেও বিশ্বমানবতার অনুভূতি প্রতীয়মান। এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছে অবশ্যই এই নানা দেশে ভ্রমণ থেকে।

অধিকাংশ ভ্রমণই ১৯১৩-এ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। শেষের দিকের তিনটি প্লেন যাত্রা বাদ দিয়ে সব সফরই জাহাজে এবং আংশিক ভাবে ট্রেনে। কয়েক ঘন্টায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছে যাওয়া আধুনিক যুগের পর্যটকদের কাছে সেই যাত্রাপথের বর্ণনা রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক।

ওনার বিমান যাত্রা বিষয়ে ভাইপো গগনেন্দ্রনাথের একটি কার্টুন আছে। কার্টুনটির অনুপ্রেরণা কবির এরোপ্লেনে লন্ডন থেকে প্যারিস যাত্রার সময়ের একটি ফোটো। গগনেন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন "কবির আকাশ বিহার"। আর এক ভাইপো অবনীন্দ্রনাথের নাতি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "দক্ষিণের বারান্দা" নামে স্মৃতিচারণধর্মী বইতে এই ছবিটির উল্লেখ আছে। বাড়ির বাজার সরকার গোপাল বাবু নাকি ছবিটি দেখে লজ্জিতভাবে বলেছিলেন "বাবামশায় উড়ছেন !"

এই প্রত্যক্ষ ভ্রমণ সাহিত্য মোটামুটিভাবে ওনার মোট লেখার দুই শতাংশ (পাতার হিসাবে)। গভীর আলোচনা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের কাজ। আমার মত সাধারণ পাঠকের নয়। এই নিবন্ধে পূর্বে উল্লেখিত 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করব। আশা রাখি, নিবন্ধের কিছু পাঠক রবীন্দ্র সাহিত্যের এই ধারাটি পড়তে অনুপ্রাণিত হবেন।

১৮৭৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ওনার প্রথম বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা "ইউরোপ প্রবাসীর পত্র"তে। পরবর্তীকালে ১৮৯০ সালে ওনার দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা নিয়ে লেখা "ইউরোপ যাত্রীর ডায়রী"।

বিভিন্ন সময়ে রচিত ওনার অন্যান্য ভ্রমণ সাহিত্যগুলি হল 'পারস্যে', 'জাপানযাত্রী', 'যাত্রী', 'পশ্চিম যাত্রীর পত্র' 'জাভা-যাত্রীর পত্র' এবং 'রাশিয়ার চিঠি'। এছাড়া 'জীবনস্মৃতি'তেও বিদেশ ভ্রমণের উল্লেখ আছে।

লেখাগুলি সময়কালের ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীর অধিক। ১৮৭৮ সালে লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'র সময়ে উনি সদ্য যৌবনে পা রেখেছেন, লেখার জায়গায় জায়গায় চটুলতা এবং উচ্ছ্বলতা নজর এড়ায় না। ডায়রীর আকারে লেখা ১৮৯০র "ইউরোপ যাত্রীর ডায়রী" সেদিক দিয়ে অনেক পরিণত, অনেক বেশী পরিমার্জিত সাহিত্যরসে সিক্ত। ১৯৩০ সালের 'রাশিয়ার চিঠি' রচনাকালে তিনি তো জীবনের সায়াহ্নে – নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সেলিব্রিটি। পরিণত বয়সের লেখার মাধুর্য ও বাঁধুনি, বক্তব্যের সুস্পষ্টতা তুলনাহীন।

****

রবীন্দ্রনাথ ১৭ বছর বয়সে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে বোম্বাই থেকে 'পুনা' নামে জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য আই সি এস বা ব্যারিস্টার হয়ে ফেরা।

যাত্রাকালের এবং ইউরোপ প্রবাসের দশটি পত্রের সংকলন এই লেখা। অতি সুখপাঠ্য হলেও কয়েকটি ব্যাপারে খটকা লাগে। প্রথমত চিঠিগুলির কোন তারিখ নেই। পত্রগুলিকে কালানুক্রমিকও মনে হয়না ধারাবাহিকতা এবং সুসংলগ্নতার অভাবের জন্য। এছাড়া চিঠিগুলি কাকে লেখা সেটা বোঝারও কোন উপায় নেই প্রাপকের নাম না থাকায়। আর কাহিনী হঠাৎ-ই শেষ হয়ে যায়।

আসলে পত্রগুলি লেখার সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কোন পরিকল্পনা কিশোর রবির ছিলনা। যা দেখেছেন, যা ভেবেছেন লিখে গেছেন এক অপরিণত সদ্য যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই কারণেই উপরোক্ত আপাত অসংলগ্নতা।

লেখাটি প্রায় দেড়শ বছর আগের। ইতিহাসের বা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র না হবার কারণে প্রেক্ষাপটের বিষয়ে সম্যক ধারণা ছিলনা। তাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা গবেষণাও করতে হয়েছে। প্রশান্ত কুমার পালের নয় খণ্ডের 'রবিজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি পরিচ্ছেদ খুবই সাহায্য করেছে ফাঁকফোকর ভরাট করে লেখাটিকে উপভোগ করতে। (ইস্কুলের ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে ছিল শেক্সপিয়ারের বেশ কয়েকটি নাটক। ভেরিটি সাহেবের টীকার সাহায্য ব্যতীত যেমন কালজয়ী নাটকগুলির মর্মোদ্ধার করতে পারতাম না।)

তৎকালীন সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং ধনী পরিবারের এক সদ্য যুবক ইউরোপ চলেছে ১৮৭৮ সালে। বোম্বাই থেকে এডেন। জাহাজ বদলে লোহিত সাগর বেয়ে সুয়েজ। সেখান থেকে ট্রেনে ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর। পরের গন্তব্য ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইতালীর ব্রিন্দিসি শহরে। সেখান থেকে ট্রেনে ফ্রান্সের প্যারিস। তারপর লন্ডন। পুরো যাত্রাকাল তিন সপ্তাহ মত। পথে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা যার মধ্যে ছিল এক সপ্তাহব্যাপী সমুদ্রযাত্রাকালের অসুস্থতা। ছিল ইউরোপের ট্রেনলাইনের দুপাশের উপভোগ্য দৃশ্যাবলী। নানা ধরণের সহযাত্রীর সঙ্গে পরিচয়।

তখনো বিজলীবাতি আসেনি। রাতের নাচের পার্টি চলে গ্যাসের আলোয়। রহস্যময়ী লন্ডনিয়া সাহেব মেমদের অবাধ মেলামেশা। জড়াজড়ি নাচ। সতেরো বছরের অত্যন্ত রূপবান যুবকটিও ভারতীয় জমিদারের সাজে সেখানে অংশ নিয়েছিল এক ফ্যান্সি ড্রেসে নাচের আসরে।

লন্ডন ছাড়াও ইংলন্ডের বেশ কয়েকটি ছোট জায়গায় থাকা কিছুদিন করে। পাশ্চাত্যের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি কয়েকটি পরিবারের অতিথি (অনুমান পেয়িং গেস্ট হিসাবে) রূপে।

তৎকালীন ইংলন্ডবাসী ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে কিছু ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য আছে। অস্ট্রেলিয়াতে তিন দশকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলব (একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও) আজও প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে এই গোত্রের মানুষের অভাব নেই ! বর্তমান কালের ইউরোপ অবং আমেরিকাতেও মনে হয় একই অবস্থা। লেখায় আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের অনেকগুলিই আজও প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ঐ সতেরো বছর বয়সেই কি অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ!

"ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল করে চিনতে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখ, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভারে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ... বাঙালিরা ইংরেজের কাছে স্বদেশের লোকেদের ও আচার ব্যবহারের যা নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতবিদ্বেষী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও করেন না। ... সাহেব সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন।"

যাইহোক, বিলেত গিয়েছিলেন মূলত ব্যারিস্টারি পড়তে। কিন্তু চিঠিগুলিতে পড়াশুনার বিশেষ উল্লেখ নেই। নানা ধরণের পার্টির (যেখানে "মেয়েরা ... আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে") আমোদ প্রমোদে অংশ নিয়েছেন, পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চা করেছেন, এখানে ওখানে ঘুরে বেরিয়েছেন, হাউস অফ কমন্সে একাধিকবার গ্যাডস্টোন প্রমুখ বিধায়কদের বক্তৃতা শুনতে গেছেন।

এই লেখায় উল্লেখ না থাকলেও, ওনার 'জীবনস্মৃতি'এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে উনি বিলেতে একলা ছিলেন না। গিয়েছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। মেজবৌদি জ্ঞানদানন্দিনী পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে সেখানেই ছিলেন। এছাড়া সম্পর্কে কাকা জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের আরো কিছু নিকট আত্মীয়ও ছিলেন।

বছর দেড়েক এইভাবে চলার পর পিতা দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ আসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের। মনে হয় দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের জীবনযাত্রার এবং পড়াশুনায় গা আলগা ভাবের সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়ে আর বেশীদিন ওনাকে বিলেতে রাখতে চান নি। হয়তো কোন মেমসাহেবের খপ্পরে পড়ার আশংকাও ছিল সাগর পেরিয়ে আসা খবরের ভিত্তিতে। ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে উনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সাথে ।

রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ প্রশান্ত কুমার পালের মতে এই দেড় বছরের প্রবাসজীবন বৃথা যায়নি। এই প্রসঙ্গে উনি লিখছেন:

"রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সিভিল সার্ভিস বা ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে আসতে পারেন নি কিংবা কোনো ডিগ্রিও নিয়ে আসেন নি, সুতরাং বস্তুগত দিক থেকে তাঁর দেড় বছরের কিছু বেশী সময়ের বিলেতপ্রবাস ব্যর্থই হয়েছে বলা চলে। কিন্তু স্থুল দেনা-পাওনার হিসেব দিয়ে জীবনের সার্থকতার-অসার্থকতার পরিমাপ করা সবসময় সম্ভব হয়না। বিলাতপ্রবাসের কথা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে লেখা আত্মকথা 'ছেলেবেলা' সমাপ্ত করেছেন – যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে তাঁর মনের বাল্যাবস্থা এরই ফলে কেটে গিয়েছিল। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে এসেছেন, তখন শুধু তাঁর গানের গলা বা 'কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল' হয় নি, তাঁর ব্যক্তিত্বটিও একটু নতুন রকমের হয়ে উঠেছিল। যে মূর্তিকারের হাতে বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তাঁর চেহারার আদল তৈরী হয়ে উঠেছিল তাতে মিশ্রণ বিশেষ ছিল না ... কিন্তু বিলেতে পৌঁছবার পর 'জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি' ..." । স্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরে লাভের খাতায় যতটুকু জমা পড়েছে তার পরিমাণ বেশী নয় – কিন্তু মানুষের কাছাকাছি থেকে ও ইংরেজের হৃদয়ের নৈকট্য পেয়ে তাঁর বাংলাদেশী চেহারায় মিশেছে নতুন নতুন মালমশলা, সেইটাই আসল লাভ – 'বিলেতে গেলেম, ব্যরিস্টর হইনি। নিজের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো – আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।' "যে বিশ্বজনীনতা রবীন্দ্র-কাব্য ও দর্শনের অন্যতম ভিত্তি তার বাস্তব প্রতিষ্ঠা এই প্রথম বিলাতপ্রবাসের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল, এইখানেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।"

কিছুটা কাকতালীয় হলেও এই লেখার দিনকয়েক আগে রবীন্দ্রত্তোর যুগের আর এক নক্ষত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুদূর ঝর্ণার জলে' পড়ছিলাম। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উনি মার্কিন দেশে থাকার প্রলোভন ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। সেই কলকাতায় – যে শহর তাঁকে নির্বাসন দিলে তিনি বিষপান করার হুমকি দিয়েছিলেন। আমেরিকা সুনীলকে আটকে রাখলে বাংলা সাহিত্য অনেক কিছু হারাত। যেমন হারাত যুবক রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে পড়াশুনা করে ব্যারিস্টর হয়ে দেশে ফিরলে, বা না ফিরলে।

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক । স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যানপ্শায়ারে । ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপারি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে । দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী । ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি । আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে।

আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

সুজয় দত্ত

আমার কবি

সবার যিনি রবীন্দ্রনাথ, তিনিই আমার প্রাণের কবি ।
দেড়শো বছর পেরিয়ে এসেও দীপ্তি-উজল তাঁর যে ছবি
এই বাঙালীর হৃদয় জুড়ে — তাতেই পরাই পুষ্প-মালা ।
তাঁর বেদীতেই অঞ্জলিদান, নিত্য-পূজার প্রদীপ জ্বালা ।

বিশ্বজগৎ মুগ্ধ হয়ে বরণমালা পরায় গলে,
তাঁর প্রতিভার আলোয় নেয়ে শ্রদ্ধা জানায় চরণতলে ।
যতই পূজি, যতই নমি, যতই রাখি সরিয়ে দূরে —
হিয়ার মাঝে তাঁর বাঁশীটি বেজেই চলে আপন সুরে ।

অনেক দূরের দেবতা নন, তিনি আমার আপন সখা ।
দুঃখে সুখে পরম সুহৃদ, আঁধার রাতে আলোকরেখা ।
তাঁর পরশে জুড়ায় জ্বালা, তাঁর পরশে পুলক জাগে,
তাঁর লেখনীর জাদুর ছোঁয়ায় জীর্ণ জীবন মধুর লাগে ।

ছিন্ন আশা, ভগ্ন স্বপন চিত্তে যখন দহন জ্বালে —
জানি 'এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে' ।
কিংবা যখন অশান্ত মন, কে যেন গায় বুকের মাঝে —
'অশান্তি যে আঘাত করে, তাইতো বীণা এমনি বাজে' ।

গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, আসে শরৎ-হেমন্ত-শীত —
তাদের নিয়ে কে আর রচে এমন মধুর অমৃতগীত ?
পথভোলা কোন্ পথিক এসে চামেলি আর মল্লিকাকে
বসন্তেরি উতল হাওয়ায় ডাক দিয়ে যায় পথের বাঁকে ?

জগৎজোড়া প্রেমের ফাঁদে কে যে কোথায় পড়ছে ধরা !
ভালবাসা কারে যে কয় — সে কি শুধুই রোদন ভরা ?
চোখেই যারে দেখিনি হায়, বাঁশী শুনেই সঁপেছি প্রাণ,
সেই আমারে কাঁদায়-হাসায় — অশ্রুসজল আনন্দগান ।

রবি গেছেন অস্তাচলে — এ-যাওয়া নয় তেমনি যাওয়া ।
অন্তরে তাঁর নিভৃত নীড়, নিত্য সেথায় আসাযাওয়া ।
ভুবনজোড়া আসনখানি হৃদয়মাঝে থাকবে পাতা —
তাঁর সুরে মোর কণ্ঠ মুখর, তাঁর বাণী মোর মর্মে গাঁথা ।

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

মানস ঘোষ

পুজোর ছলে

'ঠাকুরে'র সঙ্গে পুজোর কথা জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত,
তাই কোথাও বুঝি ভুল হয়ে যায় তোমায় বোঝায় অবিরত ।

দুঃখ শোকের মলম হলে, বিরহ বেলার পরম সাথী,
ধুপ ধূনোতে আঁধার করে উঠল সবাই পুজোয় মাতি ।

প্রবন্ধ আর কজন পড়ে, সিলেবাসের চৌকাঠে নাই ,
পাড়ার মোড়ের জয়ন্তীতে রইলে হয়ে গানবুড়ো তাই !

চর্চা বিষম হয়েছে শুনি কপিরাইট জেলখানাতে,
জানলোনা তা শ্যাম বা যদু, বৃথায় মজে ভক্তিগীতে !

সময় থেকে এগিয়েছিল উদার তোমার স্পষ্টভাষণ,
শিক্ষণীয় চিরকালই তখন যেমন আজও তেমন ।

ধর্ম-দেশের ঊর্ধ্বে তোমার স্বচ্ছদৃষ্টি ভাবনা যত
এই দুঃসময়ে রবির কিরণ বিশ্ব করুক আলোকিত !

মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

সুনন্দা বসু

আনন্দময়ী

রবীন্দ্রসাহিত্যের নারীচরিত্রের উজ্জ্বল তারকাদের সমারোহ থেকে শুধুমাত্র একজনকে বেছে নেয়া সহজসাধ্য নয় । মনে করুন সেইসব অনন্যা নারীচরিত্রের কথা – প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের স্বকীয়তায় সজীব ও সম্পূর্ণ । 'যোগাযোগের' কুমুদিনী, 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অথবা 'চোখের বালি'র বিনোদিনী তাঁদের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নারীসুলভ মাধুর্য্য এবং জটিলতা নিয়ে চিরকাল আমাদের আকর্ষণ করবে । এমনি অগণিত নারীচরিত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গল্পে উপন্যাসে ভীড় করে আছে যাদের বৈশিষ্ট আমাকে আশ্চর্য্য করে । অবাক হয়ে ভাবি আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগেই রবীন্দ্রনাথ নারীদের জন্য তাঁর লেখায় এতোটা জায়গা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন – তাদের এক দরদী মন দিয়ে বুঝেছিলেন এবং নানারঙের তুলিতে চিত্রিত করে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন এক একটি অসাধারণ, অবিস্মরণীয় চরিত্র ।

এই চরিত্রের মেলা থেকে যাঁকে আজ স্মরণ করছি তাঁর নাম আনন্দময়ী । 'গোরা' উপন্যাসের গোরা, ওরফে গৌরমোহন যাঁকে মা বলে জানে । এই উপন্যাসের নায়ক গোরা হলেও বস্তুত আনন্দময়ীকেই এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু বলে ভাবা যায় । তাঁর অতীতের একটি অসাধারণ সংকল্পই এই বাহিনীর ভিত । 'গোরা' উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে সেই সময় যখন হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি চূড়ান্তে পৌঁছানোর পর ব্রাহ্মসমাজের বুদ্ধিজীবি নেতৃবর্গ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । সেই সমাজও ধীরে ধীরে নানা কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে । গোরা প্রথমে কেশব সেনের বক্তৃতা শুনে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে হিন্দুধর্মকেই ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম ধার্য্য করে তার মধ্যেই দেশের এবং দশের মুক্তির পথ খুঁজতে আরম্ভ করেছিল । সমস্ত শিক্ষিত সমাজ যেখানে ধর্ম এবং দেশভক্তির নানা বিরোধ ধর্মী আবর্ত্তে আন্দোলিত হ'চ্ছিল, তখন আনন্দময়ীকে আমরা এক অকম্পিত দীপশিখার মতো তাঁর বিশ্বাসে স্থির দেখি । গোরা বুঝতে পারতো না কেন তিনি এক ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে আচার বিচার মেনে চলতেন না । একথা সত্য যে বালিকা এবং কিশোরী অবস্থায় তিনি সমস্ত আচার বিচার মেনেই বড় হচ্ছিলেন । তাঁর স্বামী কৃষ্ণদয়াল বাবুই তাঁকে অন্যপথে নিয়ে আসেন । কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর সত্যদর্শনের ক্ষমতা তাঁর নিজেরই । তাই শত বাধা বিপত্তি এবং নিন্দা, কুৎসা তাঁকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করেনি ।

আমরা আনন্দময়ীকে প্রথম দেখি তাঁর গৃহে : তিনি ''ছিপছিপে পাতলা, আঁটসাঁটো . . . . মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার . . . . হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম . . . . শরীরের সমস্তই বাহুল্যবর্জিত । মুখে একটি পরিস্কার ও সতেজ বুদ্ধির ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ।'' এই সতেজ বুদ্ধির পরিচয় আমরা তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজে নিরীক্ষণ করি । তাঁর জীবন কর্মময়, তাঁর হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত । তাই গোরা যখন হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর ''খৃষ্টান দাসী'' লছমিয়াকে বিদায় করতে বলে, তখন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তায় সাথে তা করতে অস্বীকার করেন । এমনকি যখন গোরা বলে যে ''. . . . বিনু (অর্থাৎ বিনয়, গোরার প্রাণের বন্ধু, আনন্দময়ীর বিশেষ স্নেহের পাত্র) তোমার ঘরে খেতে পারে না'', তখনও তিনি তার সংকল্পে অনড় থেকেছেন – বলেছিলেন, ''আমি কিন্তু, বাছা, লছমিয়ার হাতে জল খাবো, সে আমি সবাই কে বলে রাখছি ।'' এই দৃঢ়তাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য; হৃদয়ের এই প্রসারতা নিয়েই তিনি সিপাহীবিদ্রোহের শিকার খৃষ্টান দম্পতির অনাথ শিশু গোরাকে কোলে তুলে নেন তাঁর স্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও । তখন তাঁর অল্প বয়স; তবু তাঁর স্বচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না । যে রবীন্দ্রনাথের পিতামহী তার পিতামহের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেছিলেন কেবলমাত্র এই কারণেই যে তিনি ফিরিঙ্গিদের সাথে ওঠাবসা করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও উদারতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র নারীদের দ্বারাই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন সম্ভব । সেই বিশ্বাসই তিনি আনন্দময়ীর মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন ।

আনন্দময়ীকে বুঝতে গোরার সময় লেগেছে। কিন্তু বিনয় প্রথম থেকেই তার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আনন্দময়ীকে বিনা দ্বিধায় অর্পণ করে আসছে। বিনয় মাতৃহারা; কিন্তু আনন্দময়ী তাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন – মায়ের অভাব সে কখনো অনুভব করেনি। তার জীবনে আনন্দময়ী এক অপরিহার্য্য উপস্থিতি। তাই গোরার নির্দেশে তাঁর ঘরে না খাওয়া সে মেনে নিতে পারেনি। গোরার বন্ধুত্বও তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান – তার নির্দেশ অমান্য করে তার বিরাগভাজন হওয়াও তার কাছে দুঃসাধ্য। পরে যখন সে ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে ললিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন গোরার দিক থেকে প্রবল আপত্তি আসে এবং সে গোরার বৈমাত্রেয় ভাই- এর মেয়ে শশীমুখীকে বিবাহ করতে রাজী হয়। এর ফলে তার অন্তরে যে ব্যথার ভার তাকে দহন করছিল আনন্দময়ীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তা সহজেই ধরা পড়ে। এমন এক 'সুনিপুণ মাঝির মতো' তিনি তার সাথে কথোপকথন পরিচালনা করেন যে বিনয় তার হৃদয়ের কথা নিঃসংকোচে তাঁর কাছে প্রকাশ করে। বিনয়ের জীবনে যখনই কোন দ্বিধা ও সংশয় উপস্থিত হয়েছে সে তখন আনন্দময়ীকেই স্মরণ করেছে। বলেছে, ''এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখেই আমার মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপ হউক, আমাকে কর্ত্তব্যে প্রেরণ করুক।''

আনন্দময়ীর স্নেহধারা সকলের উপরই বর্ষিত হয়েছে। যারা খোলা দৃষ্টি এবং অন্তর নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে তাদের কাছে তাঁর স্বরূপ আপনিই প্রকাশ পেয়েছে। তাই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতা সুচরিতাকে দেখি সহজেই তাঁর আপনজন হয়ে উঠতে। যে ললিতা 'হিঁদুবাড়ী'-র মেয়েদের আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত নয় বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত, সেও আনন্দময়ীর মুখের কথা শুনে বিস্মিত হয়েছে। আনন্দময়ীর যখন চরম দুঃখের সময়, গোরার কারাদন্ড হয়েছে তখনও তিনি তাঁর সংযম ত্যাগ করেননি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''আনন্দময়ী কাহারো সান্ত্বনাবাক্যের কোন অপেক্ষা রাখিতেন না; তাঁহার যে দুঃখের কোন প্রতিবাদ নাই, সে দুঃখ লইয়া অন্য লোক তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সংকুচিত হইয়া উঠিত।'' তাঁকে সে সময় দেখে ললিতার উক্তি ''যেমন বল, তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য্য সদ্‌বিবেচনা'' সম্পূর্ণভাবে তাঁর চরিত্রকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে।

আনন্দময়ী রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ নারীচরিত্র। আজও আমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি। নারীর সমানাধিকার নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র লড়াই চলছে এখনো। মানুষের কুসংস্কার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও। আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ মর্য্যাদায় এক গৃহবধূর প্রবল বিশ্বাস আর সংস্কারমুক্ত বিচার বিবেচনা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের উপসংহারে গোরা তাই বলছে, ''মা, তুমিই আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই – শুধু তুমিই আমার কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।''

ইন্দ্রাণী দত্ত

সদর স্ট্রীট জার্নাল

– "বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয় নি তো ?

– 'না না, ঠিকানা তো' ছিলই; বাজারের কাছে এসে, শুধু একটু জিগ্যেস করতে হয়েছে –"

– 'পোস্টাল অ্যাড্রেস যাই থাকুক, এ' রাস্তার নাম কিন্তু সদর স্ট্রীট। হা হা। অবাক হচ্ছেন ? এই তো' লেখকের কাজ – স্থান কাল পাত্র নিয়ে খেলা করে করে পাঠককে ধন্দে ফেলে দেওয়া। ছোটোবেলা থেকেই কাজটিতে আমি পটু। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার স্বভাব বরাবরের; তার ওপর মানুষ, পশু, পাখি এমনকি জায়গার নাম বদলে দেওয়ার একটা ফেজও চলেছিল বহুদিন – আমিই এ' গলির নাম দিয়েছিলাম সদর স্ট্রীট।' – এই অবধি ব'লে কমলিকা সামন্ত কফিতে চুমুক দিলেন।

রণজয় আর সুস্মিতা মুখ চাওয়াচায়ি করল।

সুস্মিতারা মিনিট কুড়ি আগে এ' ঘরে ঢুকেছে। মফস্সলের পুরোনো বাড়ির বসবার ঘর – লাল মেঝে, বেতের সোফা, দেওয়াল জোড়া তাকে শুধু বই আর বই; বাঁধিয়ে রাখা গণেশজননীর এক কোণে কালচে ছোপ, প্রাচীন ঘড়ির সঙ্গে সুস্মিতার মোবাইলের সময় মিলছিল না। রণজয় ক্যামেরা বাগিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল – বিকেলের রোদ, কমলিকা আর ঘরভরা বই এক ফ্রেমে ধরার ইচ্ছে। জানলা দিয়ে এলোমেলো ঘাস আর কিছু গোলাপ দেখা যাচ্ছিল – একটা কালো ছোপ ছোপ বিড়াল রোদে পিঠ দিয়ে গোলাপের দিকে তাকিয়ে। গোলাপের গাছ ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে কমলিকার ছবি তোলার কথা রণজয়কে বলবে ভাবছিল সুস্মিতা – তারপর মনে হয়েছিল, বড় বড় সাদা গোলাপ, কাঠের বাড়ি আর কমলিকার ছবি আগে কোথাও দেখেছে। আসলে, কমলিকার লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত সুস্মিতা; এই মফস্সলের পুরোনো বাড়িতে সে আজ কমলিকার মুখোমুখি – এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। কমলিকা সামন্ত আশৈশব বিদেশবাসী, বাবা মা বাঙালী, লেখালেখি যদিও ইংরিজিতেই। এই বাড়ি কমলিকার দাদুর। এখানে কমলিকা সাত দিনের জন্য এসেছেন, দুপুরের দিকে একটা ছোটো ইন্টারভিউ দিতে রাজি, দাদুর বাড়ি, ওঁর ছোটোবেলা নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে – এই সকল তথ্য রণজয়ের পুরোনো বস গতকাল ফোনে জানিয়েছিলেন। বস রিটায়ার করেছেন গতবছর, কমলিকার মাসির প্রাণের বন্ধু। মাসি সংসার ছেড়ে ছুড়ে এ'গ্রামে সে'গ্রামে আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে নানা কাজ করেন-তাঁর ঠিকানা আবার প্রাণের বন্ধু ছাড়া কেউ জানেও না। কমলিকা বহুবছর পরে সম্ভবতঃ মাসির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

চমৎকার বাংলা বলেন কমলিকা; সাক্ষাৎকারের ইন্ট্রোতে সুস্মিতা সুললিত শব্দটা ব্যবহার করবে সম্ভবতঃ। কমলিকার কথার ভঙ্গিতে একটা প্যাটার্ন আবিষ্কার করছিল সে – ঈষৎ ভেবে, শব্দর পরে শব্দ সাজাচ্ছেন কমলিকা, পছন্দ না হ'লে বদলে নিচ্ছেন; শব্দ, বাক্য যেন মালার মত গাঁথছেন, দম নিচ্ছেন, হাসছেন, তারপর আবার শব্দ, আবার বাক্য –

– 'লন্ডন থেকে মা'র সঙ্গে প্রতিবছর আসতাম দাদুর বাড়িতে। শীতকালে। ঐ সময়ে লন্ডনের বন্ধুবান্ধব, সান্টা ক্লজ, ক্রীসমাস ট্রী ফেলে আসতে আমার কিন্তু কোনো কষ্ট হ'ত না। বরং সারা বছর ভাবতাম, কবে আসব দাদুর বাড়ি। প্রতিবার ফিরে যাওয়ার সময়, এয়ারপোর্টে সে যে কী কান্নাকাটি ! একবার কি হয়েছে,' দিদার ক্রীমের কৌটোয় এ'বাড়ির হাওয়া বাতাস ভরলাম – ওখানে স্কুলে গিয়ে শো অ্যান্ড টেলে বলছি – এই আমার দাদুর বাড়ির গন্ধ আর সবাই বলছে, ওমা এতো পন্ডসের গন্ধ – আমি কেঁদে আকুল হয়ে কৌটো বন্ধ করে দিচ্ছি। কী জানেন, ছোটোবেলা থেকেই গলিটা খুব অদ্ভুত লাগত – প্রতিটি বাড়িতে সকাল থেকেই চেঁচামেচি – গৃহস্থের নিত্যদিনের ঝগড়া, আবার উচ্চস্বরে রাজনীতিচর্চা, কিম্বা হয়ত

ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান নিয়ে ভয়ানক তর্কাতর্কি। এই ধরুন, সবে ভোর হয়েছে, কাক টাক ডাকছে, এ বাড়িতে ও বাড়িতে উনুন ধরানো হচ্ছে-গলি ভরে গেছে ধোঁয়ায় – তখন তো 'গ্যাস আভেন টাভেন ছিল না – আর সেই কাকভোরেই চতুর্দিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। টুবলুদা, আমার মামাতো দাদা বলত-পাগলপাড়া। হা হা।' রণজয় খচ খচ ছবি তোলে বেশ কয়েকটা।

– 'টুবলুদা ভালো লিখত, লিটল ম্যাগাজিন টিন –'

– 'টুবলুদার থেকেই কি আপনি লেখার প্রেরণা পান ?' সুস্মিতা কথোপকথন কন্ট্রোল করার সামান্য চেষ্টা করল। কমলিকা আমলই দিলেন না।

– 'সেটা পরে বলছি। তার আগে সদর স্ট্রীটের গল্পটা বলি। পাঁচ বছর বয়স থেকে মোটামুটি সবই মনে করতে পারি। আমার তখন বছর ছয় – জানলার সামনে বসে রাস্তা দেখছি – একজন লম্বা মতো ভদ্রলোক – চাপদাড়ি টাড়ি – বাজার নিয়ে ফিরছেন, আমাকে দেখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন: কে তুমি খুকী ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? কংগ্রেস না নকশাল ? আমি তো ভয় টয় পেয়ে – দিদা দিদা – বলে কাঁদতে শুরু করেছি; সেই ভদ্রলোক মুচকি হেসে সুর ক'রে বললেন: কা গোপালি নেপালি/হাতে হাতে ভোজালি – বলতো খুকী কেমন পদ্য?' – 'ছ বছর বয়সে শোনা লাইন এখনও মনে আছে আপনার? '

– 'ডায়রি লেখা শুরু করেছিলাম যে – দাদুর বাড়ির সব কথা লিখে রাখতাম। খুব বিশদে লিখতাম। ছোটো থেকেই। এনিওয়ে, তারপর ধরুন, উল্টোদিকের লাল বাড়িটা – ভোর হতেই এক মহিলা চেঁচাতেন: প্রবীর, উঠ উঠ উঠ, লুচি বোঁদে খাবি নি ? চ্যান করতে যাবি নি ? হা হা। ভাবুন একবার। এই প্রবীরদা আর টুবলুদা আবার একই ক্লাসে পড়ত। ভালো ছবি আঁকত প্রবীরদা। টুবলুদার হাতে লেখা পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিত। একবার কি হ'ল, শীতকালে আমরা যথারীতি দাদুর বাড়ি এসেছি – সেবারে বাবাও এসেছিল – বিকেলের দিকে শোনা গেল, প্রবীরদার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে – স্কুলের সামনেই বাসের তলায় – হাসপাতালেই মারা গেল। প্রবীরদার মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন – এ'বাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, প্রবীর, উঠ উঠ উঠ আউড়ে যেতেন ঘন্টার পর ঘন্টা – যেন দাদুর বাড়িরই কোনো ঘরে প্রবীরদা ঘুমিয়ে আছে। ক'দিন পরে নতুন দুটো লাইন বলা শুরু করলেন; গলি দিয়ে লোক গেলেই, ধরে ধরে : 'টিন টিন/কেরোসিন/কোথা পাই/ বল ভাই। শীত ফুরোতে আমরা লন্ডন চলে গেলাম। সামার ভেকেশনে দাদুর চিঠি এল, প্রবীরদার মা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা গিয়েছেন।'

কমলিকা কফির কাপ নামিয়ে রাখলেন। – 'মানে যেটা হয়েছিল, ঐটুকু বয়সেই দেখলাম এ'পাড়ার সবাই মুখে মুখে পদ্য বানায়। জাস্ট দুটো গল্প বললাম, আরো অনেক গল্প ছিল, ডায়রিতে লেখা আছে লাইনগুলো সমেত। আচ্ছা, জীবনস্মৃতি মনে আছে আপনাদের ? সেই যে ... আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল ... মনে আছে ? তো, টুবলুদাকে বললাম – পাগলপাড়া নয়, এ হ'ল সদর স্ট্রীট। সবাই প্রভাত পাখির গান শুনতে পেয়েছে। বয়সের তুলনায় একটু না বেশ একটু পাকা ছিলাম-প্রচুর পড়তাম তো। আমার এই ডায়লগটা সুপারহিট হয় দাদুর বাড়িতে। দাদুও চিঠিতে লিখত – সদর স্ট্রীটের জনগণ তোমা বিরহে অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে – এই সব।'

– 'আপনার এই গলি নিয়ে লেখার ইচ্ছে হয় নি কখনও ?'

– 'লিখছি অ্যাকচুয়ালি। মানে আপনাদের জটায়ুর ভাষায় – ছক কেটিচি মশায়। হা হা। ধরুন, একশো তিরিশ চল্লিশ বছর আগের দশ নম্বর সদর স্ট্রীট, সূর্যোদয়, রবীন্দ্রনাথ – তারপর মনে করুন ফিফটিজের কলকাতা-কেন্ডালদের শেকসপীয়ারিয়ানা, জেফ্রি, জেনিফার, ফেলিসিটি – সদর স্ট্রীটের ফেয়ারলন হোটেলের সিঁড়ি টপকে টপকে উঠছেন শশী

কপূর – সদ্য সদ্য জেনিফারের প্রেমে পড়েছেন – সেই সময়ের হগ মার্কেট, পাশে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম – কী ভাইব্র্যান্ট একটা জায়গা – অনেক বদনামও ছিল সদর স্ট্রীটের, এখনও আছে – যাই হোক, তার বছর দশ পনেরো পরে ধরুন নকশাল আমল – দাদুর বাড়ির ছাদের ওপর উনুনের ধোঁয়ায় মলিন সূর্য, গলির ঝগড়া, পদ্য, প্রবীর, উঠ উঠ উঠ – ক্রোনোলজি মেইনটেনড হবে না একদম – এই হয়ত, টুবলুদার সঙ্গে তরুণী জেনিফারের দেখা হয়ে গেল, ওদিকে জেফ্রি কেন্ডাল নাটকের দল নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনীকে মীট করছেন – আবার দেখুন, বলা যায় না, রবীন্দ্রনাথ সটান চলে এসেছেন প্রবীরদার বাড়ি, স্থান কাল পাত্র দুমড়ে মুচড়ে একদম গুলিয়ে দেওয়া খেলা আর কি – দেখা যাক কদ্দূর কী হয় –'

– 'এগুলো লিখতে পারি তো ?'

– 'লিখুন, অসুবিধে নেই –'

– 'লেখক হয়ে উঠলেন কীভাবে সেটা যদি বলেন –'

– 'হ্যাঁ, এবারে সেই গল্প। আসলে, লন্ডনে নিরুত্তাপ জীবন – আমি, ভাই, বাবা, মা – এমন কিছু ঘটেনি যাতে লেখার কথা ভাবতে পারি সিরিয়াসলি। যা ঘটেছিল তা' এখানেই। সেবার বুল্টুমামার বিয়ে, মা আমাকে আর ভাইকে নিয়ে এল। বাবা বোধ হয় পরে এসেছিল। এসে দেখি বাড়ি ভর্তি লোক – অর্ধেক লোককে চিনিও না – আগে দেখি নি কখনও আর কি। বিয়ের দিন, খুব ভোরে মানে ব্রাহ্মমুহূর্তে পুকুরে জল ভরতে যাওয়া হবে – যেখানে আপনারা গাড়ি পার্ক করেছেন, সেখান থেকে বাঁদিকে পাঁচ মিনিট গেলেই পুকুর – সেইসময় বেশ পরিষ্কার – ঘাট টাট বাঁধানো ছিল। সেই সকালে অনেকেই যাচ্ছিল পুকুরে, শাঁখ, কুলো, ঘড়া টড়া নিয়ে; আমিও লেপ ছেড়ে উঠে পিছু নিলাম। ছোটো তো – নিজে নিজে সোয়েটার মাফলার মোজা টোজা পরতে সময় লাগল, দেরি হয়ে গেল – এদিকে মা ঐ দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, জানেও না আমি উঠে পড়েছি। যাই হোক, একটু পিছিয়েই হাঁটছি – প্রচন্ড কুয়াশা – জল ভরতে যাওয়ার দলের কথা বার্তা হাসি সবই দিব্যি শুনতে পাচ্ছি – দেখতে পাচ্ছি না কাউকেই। এমন সময়, একজন খুব সুন্দর মহিলা – ছাপা ছাপা একটা শাড়ি, লাল চাদর, কপালে টিপ – মনে আছে এখনও – কুয়াশার ভেতর থেকে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন – ওমা তুমি উল্টো বাগে চলেছ – পুকুর তো ঐ দিকে। চলো আমার সঙ্গে । আমি ভাবলাম আত্মীয়দের কেউ বুঝি। যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে – দেখি একেবারে অন্য একটা পুকুর – আরো সুন্দর, অনেক পরিষ্কার – দিব্যি বসবার জায়গা, জল ভরার দলের কেউই নেই অথচ। সেই মহিলা বললেন, ওরা এসে পড়বে, আমি জল ভরতে শুরু করে দিই বরং, তুমি সিঁড়ি বেয়ে এসো। ভদ্রমহিলা কলসী নিয়ে জলে নেমেছেন, মানে পায়ের পাতা ভিজিয়েছেন, আর গুনগুন করছেন – আমিও পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে জলের সামনে; দেখি কুয়াশা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আর জলের নিচে, বুঝলেন, সব দেখা যাচ্ছে, মানে সমস্ত। স্বচ্ছ পরিস্কার। জলতল যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই আর একটা শহর যেন মাথা নিচু করে ঝুলে আছে। আগের রাতেই ভাই আর আমি ছবির বই দেখছিলাম – দেশ বিদেশের শহরের রঙীন ছবি – চকচকে মসৃণ বইটার পাতা – ঐ বইয়ের পাতা থেকেই যেন একটা গোটা শহর যেন ঐ পুকুরের তলায় ঢুকে পড়েছে। সেদিন মনে হয়েছিল টিবিলিসি' –

– 'মানে জর্জিয়ার রাজধানী ?'

– 'হ্যাঁ, সেদিন সেরকমই মনে হয়েছিল – পুরোনো টিবিলিসি – পাহাড়ের গায়ে ছোটো ছোটো বাড়ি, একটা চার্চ, ঘোড়সওয়ারের মূর্তি, জলের তলার টিবিলিসিতে তখন রাত, চাঁদ দেখা যাচ্ছে। কীরকম জানেন – মানে, আমার সামনে প্রথমে জল, তার তলায় টিবিলিসির মাটি, তারপর মাথা নিচে ঘরদোর, ঘোড়সওয়ার, তারও নিচে আকাশ আর চাঁদ। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল – আরও ভালো করে দেখব বলে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম জলের ওপর। কানে, চোখে নাকে টের পাচ্ছি কনকনে ঠান্ডা জল – আরো অবশ অবশ লাগছে – হঠাৎ টুবলুদার চীৎকার – এই ত্তো এই ত্তো। লাবণ্যমাসি ঝপ করে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে চিল চীৎকার – কী করছিলি এখানে ? সে এক হৈ হৈ মহাকান্ড। আমাকে ঘিরে ভীড় জমে গেল। এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিলাম, পুকুরের ওপর আবার কুয়াশা – যেন একটা দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

– 'আর সেই মহিলা?'

– 'ভ্যানিশ। সবাইকে যতই বলি, এ'বাড়িরই কেউ একজন, বিশ্বাসই করে না – পুকুরটাও একেবারেই অন্যদিকে আর বেশ দূরে। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হ'ল আমি অন্য কোনো বিয়েবাড়ির দলের সঙ্গে এসে কুয়াশায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সিঁড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি।'

– 'তাহলে ঐ জলের তলার টিবিলিসি ? জাস্ট স্বপ্ন ?'

– 'অ্যাকচুয়ালি এটাই তোমার মূল প্রশ্নের উত্তর – মানে আমি জানি না – আর সেজন্যই লিখি। অপটিকাল ইলিউশন জানো তো ? সরি সরি, এহে, তুমি বলে ফেললাম –'

– 'না না সরি কিসের, অবশ্যই তুমি বলবেন –'

– 'ছোটোবেলায় খেলেছ নিশ্চয়ই – চারটে কালো ছোপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলে – এই ধরো তিরিশ সেকেন্ড – তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে রামকৃষ্ণ বা যীশু কিম্বা রবীন্দ্রনাথ। আমার এক এক বার সেরকম মনে হয়েছে – হয়ত ইলিউশন ছিল। পরে আবার মনে হয়েছে – আসলে গুরুজনদের কথা বেজায় ইনফ্লুয়েন্স করত তো – ভেবেছি, স্বপ্নই দেখেছিলাম। ঘটনাটা ডায়েরিতে লিখেছিলাম, কাটাকুটি করেছি, নানাভাবে লিখেছি। কনক্লুশনে আসতে পারি নি। সেই শুরু। আমার লেখাতেও একটা ইলিউশন ক্রিয়েট করি, যেন স্বপ্ন। কনক্লুশন নেই, শেষ নেই, শেষ কথা বলার কেউ নেই। কত বছর ধরে এই সব করে যাচ্ছি। করতে করতে যদি কোনোদিন উত্তর পেয়ে যাই।'

সুস্মিতা এরপর সাজিয়ে আনা প্রশ্নগুলি করে। কমলিকার এ' উপন্যাস, সে' উপন্যাস থেকে প্রশ্ন, সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কাকে ভালো লাগে, ডায়াস্পোরিক লিটরেচার এই সব।

এক ঘন্টার বেশিই কেটে গেছে। সুস্মিতাদের উঠতে হবে। শেষ প্রশ্ন করল সুস্মিতা, 'আচ্ছা আপনার ছোটোবেলার এই গলি মানে সদর স্ট্রীট আর এখনকার সদর স্ট্রীটের কী পার্থক্য দেখেন ?' যতবার সদর স্ট্রীট বলছিল সুস্মিতা, নিজের দুহাতের আঙ্গুল তুলে কোট আনকোট বোঝাচ্ছিল – রণজয় হাসিমুখে ছবি তুলছিল।

– 'ছোটোবেলার মত নিয়মিত আসি না, এ' বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, ছোটোমাসি মাঝে মাঝে এসে থাকেন। সকালের চেঁচামেঁচিটা বন্ধ হয়ে গেছে – হাঁকডাক এখনও হয় তবে সন্ধ্যাবেলায় – টিভি সিরিয়ালের। আর একটা ব্যাপার, গলির শুধু নয়, পাড়ার অনেক বাড়িই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে – সে বাড়িগুলো হয় ভেঙে ফেলে অ্যাপার্টমেন্ট উঠছে – ছোটো ছোটো পায়রার খোপ, নয়তো গেস্টহাউজ বানিয়ে ফেলছে। কাউকে কবিতা বলতে শুনি না। গলির চরিত্র হয়ত বদলে গেছে। তবে আবার লিখতে লিখতে অন্য কথা মনে হয় –'

– 'কী ?'

– 'সদর স্ট্রীট রহিয়াছে সদর স্ট্রীটেই। হা হা হা।'

শেষ বিকেলের রোদ পিছনে রেখে কমলিকার ক্লোজ আপ নেয় রণজয়।

২

– 'এখন আর এই সব জায়গাকে মফস্সল বলা যায় না, তাই না ? কমলিকার ছোটোবেলায় এ'পাড়া কেমন ছিল ভাবছি। সেই পুকুরটা দেখে যাবি ?'

– 'কোন পুকুরটা ? কাছেরটা না টিবিলিসিরটা ?'

– 'তুই একটা যা তা। থাক, পুকুর দেখে কাজ নেই।'

– 'তুইই বললি দেখবি। যাব্বাবা।'

– 'নাঃ ওটা কুয়াশা – কুয়াশাই থাক, কমলিকার লেখার মত। ওঁর কথাও লেখারই মত। তাই না ? হুঁ ? আচ্ছা, ঐ যে বললেন, সদর স্ট্রীট রহিয়াছে সদর স্ট্রীটেই – মানে কী বল্‌তো ?'

– 'কী জানি, বুঝি নি। তবে ইন্টারভিউটা ভালো হয়েছে। এত কথা উনি বোধ হয় এর আগে কোথাও বলেন নি। এই, চা খাবি রে? চল ঐ দোকানটায় যাই। আরে কী হয়েছে, শর্মিষ্ঠাদি যখন কাল খবরটা দিলেন মানে ওঁর এখানে আসার খবরটা, কী বললেন জানিস ? বললেনঃ কমলিকা ঐ বাড়ি বিক্রি করার মতলবে এসেছে। ভেবে দ্যাখ, মতলবে শব্দটা ব্যবহার করলেন শর্মিষ্ঠাদি।'

– 'মতলব কেন হতে যাবে ?'

– 'আরে আমি অত কি জানি! শর্মিষ্ঠাদি বলছিলেন, কমলিকার মাসি বাড়ি বিক্রি করতে চান না। মামারা চান বোধ হয়, কমলিকার মা পঙ্গু, বোধশক্তি নেই, নিজের বোধ হয় টাকাকড়ির দরকার – মাসির সঙ্গে এবারে একটা বোঝাপড়া করতে এসেছেন।'

– 'লেখক কবিদের সম্বন্ধে বেশি না জানাই ভালো। একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে যা সব গল্প শুনেছিলাম ... এখন অবশ্য এই প্রফেশনে সেলেবদের হাঁড়ির কথা জানা হয়েই যায়।'

– 'বাদ দে। তোর কাজ হয়ে গেছে। কমলিকার যত গ্যাঁজা গুল গুছিয়ে লিখে দিবি। ব্যাস। এই দ্যাখ, ইউ টিউবে সদর স্ট্রীট এর ভিডিও পেলাম। দেখবি ? তোর লেখার কাজে লাগবে।'

– 'সে দেখে আমার কী হবে ? বরং একবার মিউজিয়ামের দিকে ঘুরে আসব কাল। এখন চা খেয়ে কাটি চল।' – 'আরে দু'মিনিটের ভিডিও। দেখে নে। তারপর উঠি।'

কমলিকা সামন্তর গলিতে তখন চুপিসাড়ে সন্ধ্যা নামছিল। ওদিকে কলকাতার সদর স্ট্রীট রণজয়ের মোবাইল স্ক্রীনে পিক্সেলে পিক্সেলে জমজমাট। মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে – ফুটপাথ, দোকান, শস্তার হোটেল, পুরোনো রেকর্ড, বই-এর দোকান – ঝকঝক করে গ্রামোফোনের চোঙ। রণজয় আর সুস্মিতার চোখের মণিতে, চশমার কাচে হলুদ ট্যাক্সি গেল একটা, দুটো, তারপর হাতেটানা রিকশায় বিদেশিনী, দোকানে মধুবনী প্রিন্টের সাদা কালো স্কার্ট, লাল চাদর বিক্রি হ'ল পরপর, হোটেলের মলিন লবিতে কে যেন মেরি ক্রিসমাস বলল, চোখ মেরে। – 'চল রে এবার ফিরি। গাড়ি পার্ক করেছিস কোথায় মনে আছে ?'

– 'তোর প্রিয় লেখকের বাড়ির সামনেই তো।' – 'এই দ্যাখ রাস্তার ওপারে একটা খাবার জায়গা – কী সুন্দর আলো জ্বলছে নিবছে – ওখানে গেলেই তো হ'ত।'

– 'আজ্ঞে না, চা খাওয়ার জায়গা নয়, ওটা গেস্ট হাউজ। কমলিকা বলছিলেন না –'

– 'চল না, দেখে আসি।'

সাইনবোর্ডে 'গেস্ট হাউজ' লেখা ছিল; বাড়ির কার্নিশে, ব্যালকনিতে আলোর মালা – যেন দুর্গাপুজো অথবা দীপাবলী – পিছনের লন আলোকিত, গাছে গাছে লাল সবুজ টুনি বাল্ব।

– 'আবার ওদিকে যাচ্ছিস কেন ? অত ঘুরে ঘুরে দেখার কী আছে ?'

– 'না দেখারই বা কি ? কোনদিন তো আসি নি। তুই এসেছিস ? আসবি আবার না ? তোর তো 'একশো আট না কত জন যেন –'

– 'ইয়ার্কি রাখ, ওখানে ঢোকার কোনো দরকার নেই।'

– 'তুই দু'মিনিট দাঁড়া। আমি যাবো আর আসব। একটু দেখে আসি। লেখাটায় যদি কিছু অ্যাড করতে পারি –'

রণজয় সিগারেট ধরিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সুস্মিতা লোহার গেট খোলে। পোর্টিকো পেরিয়ে কাচ দেওয়া দরজা – সুস্মিতা প্রথমে ঠেলা দেয় তারপর বন্ধ পাল্লায় নাক ঠেকিয়ে চোখের দুপাশে হাত রেখে ভিতরে দেখার চেষ্টা করে। ভিতরে হলঘরে বাজনা বাজছিল, সাইকেডিলিক আলো – আবছা অন্ধকারে নারীপুরুষের নাচ – এইসব দেখতে পাচ্ছিল সুস্মিতা। – 'হ'ল দেখা ? আরে আয় এবারে। এখানেই রাত কাবার করবি নাকি ?' রণজয় চটিতে সিগারেট ড'লে এগোয়।

কাচের দরজা খুলে গেল ঠিক তখনই – ব্যাঞ্জো চেলো গিটারের আওয়াজ – 'রাত বাকি বাত বাকি হোনা হ্যায় যো' ভেসে এল, আর অতীব সুদর্শন, ঢেউ খেলানো চুলের হাস্যমুখ তরুণ সুস্মিতার হাত ধরে টান দিল ভিতরে। একদম শশী কপূরের মত দেখতে ছেলেটা – রণজয়ের মনে হ'ল – ঠিক ওই রকম গুঁজে শার্ট পরা, চওড়া বেল্ট, তার ওপর ব্লেজার। দরজা বন্ধ হয়ে গেল দড়াম করে।

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর্জলি যাত্রা

শুক্রবার, কাজ প্রায় শেষ,
তাই বিকেল যেন আগে থেকে শুরু
রোদ পড়ার আগেই নামলাম রাস্তায়।
প্রথমে দুশো ছয়, তারপর
চারটে চল্লিশে ব্যান্ডেল লোকাল,
সরেছে বিকেলের শহরতলী
সরেছে গোধূলীর মফস্বল
ঝনাৎ ঝনাৎ ঘণ্টা বেজে
নিভে আসে রাখালিয়া সূর্যঘড়ি ...

ছটা সতেরোয় ফেরীঘাট
নীল তারপলিন জড়ানো বাঁশের পঞ্চভুজ,
তলায় রসুল মিয়াঁর চায়ের ঠেক,
তেল কুপি জ্বলে ওঠে
কঞ্চি ঠোকা বেঞ্চি ... ঠাণ্ডা লাগে ।
ঘষা কাঁচের বয়াম, খাস্তা বিস্কুট,
প্লাস্টিকে টক ঝাল চিপস,
শ্যাম্পুর পাতায় নামে বিকেলের
বেগুনী আলো ...

লাল পতাকা ডিঙিতে উঠে বসি
হলুদ নদীর জলে ভেসে যায় আমার মুখ
ভেসে যায় দুপুরের রোদ,
ভেসে যায় স্টেশনের অপেক্ষাঘর
ভেসে যায় শহরতলী, মফস্বল, ফেরীঘাট
ঘষা কাঁচে লেগে থাকে সূর্যঘড়ির তাপ, একা ...

সন্ধ্যের উনুন পরে,
ওপারের সাদা ধোঁয়ায় সেতু বাঁধে আকাশ
ঘাটে বাঁধা বুড়ো অশ্বত্থ গাছ
হাঁটুজল পা ডুবিয়ে ডাকে "আয় আয় ...
এতো তোরই বাড়ি, চিনতে পারলি না ?"

এলাচের ঘ্রাণে চিনচিন করে ওঠে জন্মদাগ ...

দেব বন্দ্যোপাধ্যায় – পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেষক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা । দেবের লেখা কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । দেব সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা ।

শহিদুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথের গণতন্ত্র-ভাবনা

পৃথিবী আজ কয়েকজন 'আমি'র দখলে চলে গেছে আর গণতন্ত্র আইসিইউতে মৃত্যুর সাথে পাল্লা লড়ছে। 'গণতন্ত্র' একটি পুঁজিবাদী মীথ। সামন্তবাদী মীথ 'আভিজাত্যবাদ'কে ধ্বংস করে 'গণতন্ত্রের' এই মীথটি মানুষের চিন্তার জায়গাটি দখল করে মাত্র চার/পাঁচশ বছর আগে। এসব 'মীথ'ই ক্ষমতাবান শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই দেখা যায় শাসকশ্রেণীর পরিবর্তনের সাথে সাথে সেইসব 'মীথ' গুলিও পরিবর্তিত হয়। সামন্ততন্ত্রে রাজা-বাদশা-জমিদার-অভিজাত শ্রেণী ছাড়া আর কারো স্বাধীন চিন্তা করার কোনো অধিকার ছিল না। জমিতে কৃষিকাজ করতে বাধ্য থাকতো কৃষকশ্রেণী আর জমিদার তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকতো। সেই সামন্তবাদী সমাজে শেষ প্রান্তে এসে সমাজে এক নতুন ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তারা কেবল নিজের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করতো না, বাজারের জন্যও উৎপাদন করতো। ব্যবসায়ী শ্রেণী ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠলে তাদের সঙ্গে জমিদার-অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী স্বাধীন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে লড়াই বিপ্লবে পরিণত হয়। ইতিহাসে সে বিপ্লবের নাম ফরাসি বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সে বিপ্লবে অভিজাততন্ত্র পরাজিত হয় এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী অর্থনেতিক-সামাজিক নেতৃত্বে উঠে আসে। সামন্ততন্ত্রের পরাজয় এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিজয়ের মধ্য থেকে 'অর্থনীতি' শাস্ত্রের জন্ম হয়। সে লড়াই-এ ব্যবসায়ী শ্রেণী সকলকে টেনে আনার জন্য একটি মুখরোচক ভাবাদর্শের প্রয়োজন বোধ করে। শয়তানের মত চতুর ব্যবসায়ী শ্রেণী তখন 'স্বাধীনতা'র বাণী উচ্চারণ করতে থাকে। সামন্তবাদী সমাজের স্বাধীনতাহীন মানুষের কাছে স্বাধীনতার সে বাণী মধুর মত মনে হয়। তারা মুক্তির স্বপ্ন দেখতে থাকে। দলে দলে তারা জমির বন্ধন ছিন্নকরে ব্যবসায়ী শ্রেণীর পিছনে জড়ো হয়। বিপ্লব জয়লাভ করে। 'স্বাধীনতা' যেন সামন্তবাদী সমাজের 'অভিজাততন্ত্রের' মিরর ইমেজ, সেটা তারা বুঝতে পারে না। বিজয়ী ব্যবসায়ী শ্রেণী (পরবর্তীতে বুর্জোয়া শ্রেণী বলে পরিচিতি লাভ করে) ক্রমে পৃথিবী দখল করে। সামন্তবাদী সমাজের কৃষকশ্রেণী পুঁজিবাদী সমাজে 'স্বাধীন' শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীন (?)। সামন্তবাদী সমাজের মত জমিতে কাজ করতে বাধ্য নয়। কাজ করলেই পারিশ্রমিক – না করলে নাই। এভাবে বারো হাজার বছর আগে সূচিত 'সভ্যতা' নানাপথ পাড়ি দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। এখানে ভলতেয়ার-রুশা-আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। সচল পুঁজি সামন্তবাদী অচলায়তনকে ভাঙ্গলেও নতুন ক'জন 'অভিজাতশ্রেণীর' জন্ম দিয়েছে। তারা মাত্র এক শতাংশও হবে না। অথচ পৃথিবীর সমগ্র সম্পদের অর্ধেকেরও বেশী তাঁদের দখলে। ফরাসি-বিপ্লবের মনোমুগ্ধকর শ্লোগান 'সাম্য, মৈত্র ও স্বাধীনতা'র ফাঁকি আজ ধরা পড়েছে। সেদিন স্বাধীনতাকামী মানুষ বোঝেনি যে 'সাম্য' না থাকলে 'মৈত্রী' ও 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না। 'স্বাধীনতার' নামে বুর্জোয়া শ্রেণী 'ক্ষমতা' দখল করে। সে কাহিনী আজ মোটামুটি সবার জানা।

(দুই)

পাঠক ভাবতেই পারেন রবীন্দ্রনাথের ওপর কিছু লিখতে বসে আমি কেন ওপরের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ? আজ কেবল গান ও কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্দী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে একটি মহাসাগর – সে কথা ক'জন জানে ? প্রশ্ন উঠেছে ''রবীন্দ্রনাথ কে পড়ে আজ ?'' নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল দেড়শ' বছর তার কতটা বজায় রয়েছে। সার্ধশতবার্ষিকীতে ২০১১ সালে জেমস ক্যামবেল লন্ডন টাইমস সাপ্লিমেন্টে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। ইংরেজি ভাষাভাষি অঞ্চলে রবীন্দ্রচর্চা হ্রাস পেলেও ক্যামবেলের মতে স্পেন ও ল্যাটিন আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ এক নতুন প্রেরণা হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। ফ্রান্সের নোবেল-জয়ী উপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ রবীন্দ্র কবিতার সৌন্দর্য অস্বীকার করেন নি এবং তিনি সে ভাষায় গীতাঞ্জলী অনুবাদ করেন। চিলির নোবেল

জয়ী কবি পাবলো নেরুদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ২০টি প্রেমের কবিতা শীর্ষক সংকলনে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেন (আতিউর রহমান Inclusive Development and Rabindranath Tagore, Bangladesh: Yesterday Today Tomorrow, Essays in Honour of Professor Sanat Kumar Saha, Sahitya Prakash, 2016)। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে একজন অতিন্দ্রিসবাদী কবি হিসেবে মনে করা হত । যেন তিনি ইহজাগতিকতায় অন্যমনস্ক ছিলেন । সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাইকেল কলিন্স । তিনি তাঁকে বর্তমানের একজন সমাজ সচেতন দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 'Tagore and his India' গ্রন্থে অমর্ত্য সেনও সে ভুল ভেঙ্গে দেন । তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি সমকালীন রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ১৯১৬-১৭ সালে জাপান ও আমেরিকায় 'জাতীয়তাবাদ'-এর ওপর বক্তৃতায় তিনি জাতীয়তাবাদের সাফল্যের পাশাপাশি একথাও তুলে ধরেন যে পশ্চিমা বিশ্বে 'মানবতাবাদের' পশ্চাদাপসারণ ঘটেছে এবং তারা ক্ষমতার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে । তার সে বক্তৃতা জাপান ও আমেরিকার মত ভারতেও ভালভাবে গৃহীত হয় নি ।

আন্তর্জাতিকতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন কট্টর গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কবি । তাই জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ । তাঁর বহু লেখায় তার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি । তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশ শাসকরা একদিন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলবে । কিন্তু তাঁর সে দৃঢ় বিশ্বাস কিভাবে ধ্বংস হয় গেল, সেকথা তিনি জীবনের শেষ বছরে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে অকপট ভাবে তুলে ধরেছেন । ''যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তভাবে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য ।'' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃঃ ৭৩৫) । তাই ''য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল ।'' তিনি লক্ষ্য করেন, ''সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত । এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে ।'' তাই গভীর দুঃখের সাথে বলেন, ''জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ — এই সভ্যতার দানকে । আর আজ বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল ।'' রবীন্দ্রনাথের এই খোলামেলা মন্তব্যে প্রমাণ হয়ে যায় যে সামন্ততান্ত্রিক-সভ্যতা-ধ্বংসকারী পুঁজিবাদী সভ্যতা প্রকৃত 'গণতন্ত্রকে' ধারণ করতে পারে না । আগেই বলেছি গণতন্ত্র একটি ভাবাদর্শ যা পুঁজিবাদী সমাজকে টিকে রাখতে সাহায্য করে । গণতন্ত্র যেমন একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শ পুঁজিবাদী সেরকম একটি শাসকশ্রেণীর তৈরী 'মীথ' । আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক শেষে দাঁড়িয়ে ১৩৪ বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা উলঙ্গ হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । এই 'গণতন্ত্রের' সামনে এসে দাঁড়াতে পারবেন না ঊনিশ শতকীয় প্রবক্তা ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখ ।

'গণতন্ত্রের' এই পতনের কারণ কি ? সে কথাও রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন ১২৯২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের ''ভারতী পত্রিকায়'' বিবিধ প্রসঙ্গ-২ প্রবন্ধে । প্রবন্ধের শুরুতে কয়েকজন আমি'র কথা লিখেছি । তারাই আজ পৃথিবী থেকে 'গণতন্ত্রের' উচ্ছেদ করেছে । রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে বলেন, ''এক 'আমি' মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়েছে দেখো । 'আমি' কে যেদিন লোপ করিয়া ফেলিবে অমনি প্রকৃতির পুর্ব-পশ্চিমে, অতীত-ভবিষ্যতে, অন্তরে-বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে ।'' 'আমি' আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে । কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি । মনে করিতেছি আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ, জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু 'আমার পিঠ' ও 'আমার পেট'-এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না । 'আমি'কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে । সেখানে যত বিবাদ,

যত অনৈক্য, যত বিহঙ্গলা, 'আমি'টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।'' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খন্ডঃ ক বিবিধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০ পৃঃ ৯৩৬)।

(তিন)

সব কথার শেষ কথা। তথাকথিত পুঁজিবাদ-সৃষ্ট 'গণতন্ত্র' পৃথিবীতে আজ কয়েকজন 'আমি'র জন্ম দিয়েছে। তারা কি ভয়ংঙ্কর হিংস্রতার সাথে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে, এই মুহূর্তে তার নজির সারা পৃথিবীর দেশে দেশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ করার আগে বর্তমানের পরিস্থিতি সম্পর্কে 'The Global Polical Economy' পত্রিকায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ 'পুঁজিবাদ তো ব্যর্থ, তাহলে এরপর কি ?' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। একটি অসাধারণ কার্টুন লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। সেই প্রবন্ধের শুরুর স্তবকটি তুলে ধরে আজকের লেখাটি শেষ করবো। এতে প্রমাণ হবে ১৩৪ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলে গেছেন, আজ উক্ত পত্রিকা সেই একই কথা বলছে।

''২১ শতকের দুই দশক এখনো পেরোয়নি, কিন্তু এর মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের ব্যর্থতার নজিরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, অর্থনীতির আর্থিকিকরণ ও মানবোতিহাসের সবচেয়ে তীব্র অসমতায় পৃথিবী এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। . . . বেকারত্ব, কাজের অভাব, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র, ক্ষুধা, জীবন ও সম্পদের অপচয় এবং আজকের দিনে যাকে বলা যায় বাস্তুতন্ত্রের 'মৃত্যুর সর্পিল সিঁড়ি।' আমাদের সময়ে প্রযুক্তির সেরা উদ্ভাবন হচ্ছে ডিজিটাল বিপ্লব। কিন্তু সেই বিপ্লব মুক্ত যোগাযোগ ও স্বাধীন উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গিয়ে নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকের স্থানচ্যুত করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। উদার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে গেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পশ্চাদ্দেশ সুরক্ষাকারী ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদ আবারও সামনের দিকে হাঁটা শুরু করেছে; সঙ্গে আছে পিতৃতন্ত্র, বর্ণবাদ ও যুদ্ধ।'' তাই পত্রিকা বলছে সামনে আজ দু'টি বিপ্লব, যদি আমরা বাঁচতে চাই, পৃথিবীকে বাঁচাতে চাই। এক, সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠন এবং অন্যদিকে বিদ্যমাণ শ্রেণীর ধ্বংস (thepapyrus.net)।

রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে যারা বলে, তারা ভুল অথবা মিথ্যা বলে।

শহিদুল ইসলাম – সাবেক অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন বিভাগ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বঙ্গবন্ধু ইনস্টিটিউট অব লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড বাংলাদেশ স্টাডিজ, শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জ। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তি ২০১৩।

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের জীবনে আরও একটি বাইশে শ্রাবণ

"আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে ।।
সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে,
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে" ।। . . .

০৭ আগস্ট, ১৯৪১ । ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ । কবি পুবদিকে মাথা করে শুয়ে আছেন । অচৈতন্য । নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে । বেলা যতো বাড়ছে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে লোকের ঢল নামছে । তাদের মধ্যে কে বা কারা যেন ব্রাহ্মসঙ্গীত গাইছেন । বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে 'পিতা নোহসি' মন্ত্রপাঠ করছেন । রামানন্দ বাবু খাটের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন । বেলা ১২ টা বেজে ১৩ মিনিট । কবির ডান হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে কপালের কাছে গিয়েই পড়ে গেলো । অন্যভুবনে পাড়ি জমালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কবি যেদিন চলে গেলেন সেদিনের তারিখটা ছিল বাইশে শ্রাবণ । সেদিনের কথা ভুলিনি – অনেকেই ভোলেননি । সেদিন আমারই মত লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধ এক বেদনায় তাড়িত হয়ে ফিরেছিল পথে পথে । তবু এ রচনা কবির মৃত্যুদিনের প্রসঙ্গে নয় ।

তার নিজের জীবনেও এসেছিল এক বাইশে শ্রাবণ । এক একটি করে আঁখির নাগাল এড়িয়ে আপনজনেরা চলে যাচ্ছে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে । নীরব স্থৈর্যের সঙ্গে কবি এই বিদায় মুহূর্তগুলিকে গ্রহণ করেছেন বারবার ।

তিরিশের দশকের গোড়াতেই কবি ফিরে এলেন রাশিয়া ভ্রমণ সেরে । দু-বছর পরে গেছেন পারস্যে । দেশে দেশে জন্মভূমি সন্ধানের সাধনা চলছে । সত্তর বছর পূর্তির বিশাল উৎসব হয়ে গেছে । মন প্রফুল্ল না থাকার কোনো কারণ ছিল না । এমন সময়ে পরম যন্ত্রণার লগ্ন শ্রাবণ হয়ে ফিরে এলো ।

প্রথম দুটি কন্যাকে কবি হারিয়েছিলেন অনেক দিন আগে । ছোটো মেয়ে মীরার প্রতি ছিল গভীর ভালবাসা । সেই মীরা ও নগেন্দ্রনাথের ছেলে নীতীন্দ্রনাথ । বাইশে শ্রাবণের সেই মর্মান্তিক ঘটনায় যাওয়ার আগে আমরা তাঁর একুশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনটা একটু দেখে নি । ৮ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছেন, ". . . আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে আমায় কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে । . . ."

গোড়ার দিকে নীতীন্দ্রনাথকে 'নিতাই' বা 'খোকা' নামে ডাকা হত, মীরাদেবীকে লেখা একাধিক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'নিতাই' এর উল্লেখ করেছেন । নীতীন্দ্রনাথ নামকরণ করা হলে পারিবারিক মহলে আপত্তি উঠেছিল, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথের পরলোকগত তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল 'নীতীন্দ্রনাথ' । রবীন্দ্রনাথ ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ তারিখে আমেরিকার কেমব্রীজ থেকে নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

". . . মীরা লিখেছে তোমার ছেলের নাম নীতু রাখলে কেউ কেউ তার নাম উচ্চারণ করতে পারবে না । এ কথার কোনো মূল্য নেই । ওঁরা কি রবি সিংহের নাম করেন না ? মেজদাদার নামের সঙ্গে সত্যের নামের যোগ আছে বলে কি মেয়েরা সত্যকে আর কিছু বলে ডাকে? বাবামশায়ের নাম তো খুব সাধারণ, সে নাম কি কেউ উচ্চারণ করে না?" . . .

নীতীন্দ্রের অন্নপ্রাশন হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯১৩। আমেরিকার আর্বানা থেকে রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখছেন (মার্চ ১৯১৩),

". . . অন্নপ্রাশনে তোর খোকার বর্ণনা শুনে তাকে খুব দেখবার জন্য আমার খুব লোভ হচ্চে। ও কি বক্তৃতা করবার কোনো আয়োজন এখনো সুরু করে দেয় নি ?"... কাছাকাছি সকলের উপরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর হোমিওপ্যাথি প্রয়োগ করতেন, নাতির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ১৯১৩ জুলাই মাসে লন্ডন থেকে মীরা দেবীকে লিখেছেন,

"মীরু তোর খোকার হাঁ করা হাবলা ছবিটা mantle piece-এর উপর আছে – সেটা প্রায়ই আমার নজরে পড়ে এবং ওকে দেখবার জন্যে আমার মনটা উতলা হয়। ওর Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস। ডাক্তারি বই দেখলেই জানতে পারবি Eczema বসে গেলে শরীর ভারি অসুস্থ হয় – অল্পেতেই অসুখবিসুখ করতে থাকে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি Eczema সারানো ভালো নয়। Sulphur ২০০ আনিয়ে নিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস। তারপর আবার একমাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস। Eczema যদি বসে গিয়ে থাকে তাহলে Sulphur-এ সেই দোষ নিবারণ করবে"। . . .

মীরাদেবীর সঙ্গে স্বামী নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ক্রমে জটিল হয়ে ওঠায় মীরাদেবী নীতীন্দ্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনেই বাস করতে থাকেন। প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন (র/৮-৭৪) যে 'তার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে সংসার করা মীরাদেবীর পক্ষে সম্ভব হত না, তিনি পুত্রকন্যাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকতে পছন্দ করতেন'। (তাঁদের কন্যা নন্দিতার জন্ম হয় ১২/০৭/১৯১৬, নীতীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি সাড়ে চার বছরের ছোটো)। নীতীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ চাইতেন বালকপুত্র তার কাছেই থাকুক। এই জন্যে মাঝেমধ্যে মীরা দেবীকে নীতীন্দ্রকে নিয়ে নগেন্দ্রনাথের কর্মস্থল কলকাতা, পুণা, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে থাকতে হয়েছে। অ্যানড্রুজ তাদের পারিবারিক ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ নগেন্দ্রনাথ তাঁকে কিঞ্চিৎ সমীহ করতেন। অ্যানড্রুজ বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখছেন,

"খোকার (নীতীন্দ্রনাথের) ইশকুলের ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তিত আছি। ওকে কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে – মুশকিল হল, ইশকুলের ছুটি হলে ওকে কলকাতায় যেতেই হবে – এবং তখনই শুরু হয়ে যাবে ওকে নিয়ে টানাটানি। আমি প্রথমে যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ক্রমে তার চাইতে খারাপই হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তবে আমি আশা ছাড়ছি না। মীরার কেমন লাগে তা আমি খুবই বুঝতে পারি। সে এখন খোকাকে শান্তিনিকেতনে রাখার জন্যে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত আছে। সে বুঝতে পারছে যে তার নিজের জীবনে আর কোনো বড় পরিবর্তন ঘটবার আশা নেই। তবে তাই নিয়ে সে বসে থাকতে রাজি নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে তার ছেলেমেয়েদের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে থাকতে চায়। শুধু খোকা যদি এখানে থাকতে পারে মীরা অনেক শান্তিতে থাকবে। কিন্তু নানা অছিলায় নগেন তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় – এবং এই ছুটিটা শেষ হবার পরেও সে সেই চেষ্টাই করবে এব্যাপারে আমি একরকম নিশ্চিত।" . . .

তাঁর একুশ বছরে জীবনের প্রায় পুরোটাই তাঁকে নিয়ে তার বাবা ও মায়ের মধ্যে টানাটানির ইতিহাস। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বে তাঁর পরিবারসুলভ অন্য গুণাগুণের কোনো অভাব ছিল না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর, পূজোর ছুটি আরম্ভ হবার দুদিন আগে শান্তিনিকেতনে শারোদৎসব-এর রূপান্তর ঋণশোধ নাটিকার অভিনয় হয়, নীতীন্দ্রনাথ এখানে 'বালকগণ'-এর মধ্যে অভিনয় করেছিলেন। এই সময় তাঁর দশ বছর বয়স। তিনি গানও গাইতেন-এলমহার্স্ট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন,

". . . ২৩ জানুয়ারি ১৯২২ তারিখে সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে পিয়ার্সনের বাড়ির সামনের মাঠে একটি সান্ধ্য আসর বসেছিল, সেখানে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক সিলভাঁ লেভি, শ্রীমতি ইঘেন, রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মৃণালিনী, পদ্মজা নাইডু প্রমুখ, সেখানে নীতু, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতি ইঘেন সংগীত পরিবেশন করেন। এই স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায় বারো বছর বয়সে তাঁর সংগীতকণ্ঠ সাধারণের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের ছিল, তা না হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক আসরে (এবং সম্মানিত অতিথিদের সামনে) গাইবার সুযোগ তিনি পেতেন না"। . . .

অভিনয়ও যে তিনি ভালো করতেন, তার প্রমাণ আছে সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে। এই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে শারোদৎসব অভিনয়ের আয়োজন হল কলকাতায়, আলফ্রেড থিয়েটারে। *দি ইন্ডিয়ান ডেইলি নিয়ুজ* প্রথম অভিনয়ের একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে নীতীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে লেখা হয় (বঙ্গানুবাদ)

". . . শ্রীমান নীতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, কবির বালক পৌত্র, উপেন্দ্রর ভূমিকায় অতি সুন্দর অভিনয় করিয়া অভিনয়ের আত্মাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়সের পক্ষে তাঁহার অভিনয় অত্যন্ত পরিণত স্তরের হইয়াছিল" . . .

তাঁর পিতা নগেন্দ্রনাথের অনেকদিন কোনো নিশ্চিন্ত উপার্জন ছিল না। এই সময়ের কিছু আগে (ডিসেম্বর ১৯২১) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে মাসিক পাঁচশ টাকা বেতনে গুরুপ্রসাদ সিং প্রফেসর অন এগ্রিকালচার পদে নিযুক্ত হয়েছেন, বিজ্ঞান কলেজের একটি কোয়ার্টারে তাঁর থাকবার স্থানও নির্ধারিত হয়েছে। তবু তিনি সব সময়েই দাবী করতেন যে পুত্রকন্যা, বিশেষত পুত্র তাঁর কাছে থাকবে – সুতরাং পুত্রকে, এবং তাঁর সঙ্গে মীরাদেবীকেও প্রায়ই এসে বালীগঞ্জে থাকতে হত। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সমস্ত সমস্যা এড়াবার জন্যে প্রস্তাব করেন, নীতীন্দ্রনাথকে বিলেতে রেখে পড়াশুনো করাবার। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি জামাতাকে একটি চিঠি লেখেন,

". . . মীরা তোমার কাছ থেকে দূরে থাকলে তোমার সম্বন্ধে লোকনিন্দার আশঙ্কা আছে বলে তুমি কল্পনা করচ। মীরা নিজের সম্বন্ধে লোকনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না তোমাকে লিখেচে শুনে আমি খুশি হলুম। জীবনে সব মানুষের ভাগ্যে সুখ থাকে না – তা নাই বা থাকল – কিন্তু স্বাধীনতা যদি না থাকে তবে তার চেয়ে দুর্গতি কিছু হতে পারে না। . . . সকল পক্ষের কথা ভেবে আমার মনে একটা সংকল্প জেগেছে। নীতু ও বুড়ির ভালোরকম পড়াশুনোর জন্যে মীরার সঙ্গে ওদের আমি ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেব ঠিক করেচি। পিয়র্সন মার্চ মাসে যেতে চাচ্চে, ওর সঙ্গে দিলে আমার কোনো ভাবনা থাকবে না। তুমি সবাইকে বলতে পারবে, পড়াশুনো করবার জন্যে ওরা বিলেতে গেছে। . . . ওদের বিলেতে পাঠাতে অনেক খরচ হবে জানি কিন্তু সেও আমি আনন্দে স্বীকার করব"। . . .

এই চিঠিটা থেকে নীতীন্দ্রনাথের মা-বাবার তৎকালীন সম্পর্কে, সমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা, সমস্তই পরিস্কার হয়ে যায়।

নগেন্দ্রনাথ এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবার জন্য অনুমতি ও পাথেয় পেলেন – তাঁর প্রতিমাসের বেতন ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে। নীতীন্দ্রনাথকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু পুত্রের জন্য পাথেয় প্রার্থনা করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছেই। রবীন্দ্রনাথ পিয়র্সনের হাতে ৫০০ টাকা পাঠিয়ে চিঠিতে নগেন্দ্রনাথকে লিখলেন (১১ এপ্রিল ১৯২৩)

". . . য়ুরোপের মহাদেশে তুমি যেখানেই যাও আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে একথা জানলে যথেষ্ট পরিমাণে আদর ও আনুকুল্য পেতে তোমার কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না"। . . .

তবে নগেন্দ্রনাথ এক রকম জোর করেই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেও, সেখানে গিয়ে তাঁর শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে তাঁর কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁরা যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে পিয়র্সনও ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ইংল্যান্ডে স্কুলজীবন সমাপ্ত হলে সেখান থেকে নীতীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে পাঠানো হয় ছাপাখানার কাজ ও প্রকাশনা ব্যবসায় শিক্ষা করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ এই আয়োজনটি পছন্দ করেননি, তিনি দৌহিত্রের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। জেনিভা থেকে তাঁর মা মীরাদেবীকে লিখছেন, (২৫ আগষ্ট ১৯৩০)

". . . রাণীর চিঠিতে খবর পেলুম নীতুকে বোম্বাই পাঠানো হয়েছে ছাপার কাজ শিখতে। ভালো লাগল না কারণ বোম্বাই অস্বাস্থ্যকর। ওখানে এক জাতের ম্যালেরিয়া আছে যেটা খুব খারাপ। এখানে বিশেষ চেষ্ঠা করে ভালো ব্যবস্থা করেছি। এ

রকম সুবিধা ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যে সহজে জোটে না। সব চেয়ে ভালো শিক্ষা পাবে সব চেয়ে আদরযত্নে এবং সব চেয়ে কম খরচে। ওকে আমি কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হব। এই সুযোগটা ছাড়লে নীতুর প্রতি অন্যায় করা হবে। এখানে ও মানুষ হয়ে উঠবে কেবলমাত্র মজুর নয়"।...

নীতীন্দ্রনাথকে লিখেছেন ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক থেকে,

"...জর্মানীতে পৌঁছে অবধি আমি তোর জন্যে চেষ্ঠা করেছি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে... সেই বন্ধুদের চেষ্ঠায় ভালো ব্যবস্থা হতে পেরেচে। প্রথমে তোকে ম্যুনিকে শিখতে হবে তার পরে লাইপজিকে। লাইপজিকে শুধু কেবল ছাপানো নয় Book Publishing ও শিখতে পারবি – তা ছাড়া অন্য সবরকম শেখবার আয়োজন আছে"।... এই চিঠিতে আরো লিখেছেন,

"...আমি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দেশে ফিরব – কিন্তু বোম্বাই দিয়ে নয়, কলম্বো দিয়ে। সুতরাং পথে তোর সঙ্গে দেখা হবে না। যাই হোক জর্মানীতে যাওয়া যখন স্থির হয়েই গেছে তখন এইবার বার্লিনে আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে কথাটা পাকা করে নেব। আমার খাতিরে ওরা তোকে খুব যত্ন করেই শেখাবে"।...

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নীতীন্দ্রনাথ মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশন শিল্প বিষয়ে অধ্যয়ণ করতে জার্মানীতে যান। 'বিশ্বভারতী নিয়ুজ'-এর সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সংখ্যায় লিখিত হয়েছে, তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মানী যান। জুন মাসে ধরা পড়ল নীতীন্দ্র যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আশঙ্কার ছায়া নেমে এল রবীন্দ্র পরিবারে। স্বভাবতই একমাত্র দৌহিত্রের জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন কবি। একলা বিদেশে তরুণ নীতীন্দ্র কঠিন রোগে আক্রান্ত – উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সেই সময় ইংল্যান্ডে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছিলেন গান্ধীজি – সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন অ্যানড্রুজ। তাঁর কাছে খবর পৌঁছাল – কবি উদ্বিগ্ন নীতীন্দ্র অসুস্থ।

রবীন্দ্রনাথের এই অকৃত্তিম সুহৃদ তাঁর অন্য কর্ত্তব্য ত্বরিতে সমাধা করে ছুটে গেলেন জার্মানিতে। জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিন মাসে তিনি যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে নীতীন্দ্রের শেষ দিনগুলির এবং ঘনমসীমাখা একটি বাইশে শ্রাবণের ছবি তুলে রাখা আছে। ১১ জুন অ্যানড্রুজ লিখলেন কবিকে,

"...ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা খুব ভালো লোক। পৃথিবীতে আর কোথাও এর চেয়ে ভালো চিকিৎসা হতে পারে না। নীতুর অবস্থা খুবই গুরুতর তবে একদম হতাশ হওয়ার মতন নয়। রক্তক্ষরণ হয় নি তবে দুটি ফুসফুসই আক্রান্ত। নীতু এখনো জানে না কি দুরারোগ্য ব্যাধিতে সে ভুগছে।... নীতুকে স্থানচ্যুত করা উচিত হবে না"।... তবে ভরসাও খুব একটা দিতে পারলেন না। বললেন, "...শরীর তাঁর স্বাভাবিক প্রতিরোধটুকু এখনো করে চলেছে – it is yet a drawn battle"।...

নীতীন্দ্র অ্যানড্রুজ সাহেবকে পেয়ে খুব খুশি। তিনি বুঝতে পারেন নি যে তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই অ্যানড্রুজ এসেছেন। সাহেব জানিয়েছেন প্রকাশকদের সঙ্গে দেখা করতেই তার লাইপজিগে আসা। নীতীন্দ্র অনুরোধ করেছেন যে আরও কিছুদিন তাঁর কাছে থাকতে হবে। অ্যানড্রুজ তো একপায়ে খাঁড়া। এই অনুরোধেরই তো অপেক্ষা। লিখলেন কবিকে,

"...মীরাকে বোলো নীতু আমায় পেয়ে খুব খুশি, আরও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকতে বলেছে – and I have promised to do so"।...

ইতিমধ্যে নীতীন্দ্রের পিতা নগেন্দ্রনাথ এসে গেলেন পুত্রের কাছে। অ্যানড্রুজ গেলেন ইংল্যান্ডে – ফেলে আসা কাজগুলি গুছিয়ে আসতে। সেখানে খবর পেলেন ধীরেন্দ্রমোহন সেন আর মীরাদেবী আসছেন নীতীন্দ্রের কাছে জার্মানিতে। নগেন্দ্রের চিঠিতে জানলেন অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। জেনোয়া থেকে ২৫শে জুলাই চিঠিতে লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে,

"... আপনার এই দারুণ প্রয়োজনের সময় আমি যে ইউরোপে থেকে আপনাকে সাহায্য করতে পারছি এটা আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ"।...

২৬শে জুলাই অ্যানড্রুজ গেছেন স্কোমবার্গে, যেখানে আছেন নীতীন্দ্র। পথের উদ্বেগ পার হয়ে মীরাও পৌঁছেছেন ছেলের কাছে। জেনোয়া থেকে সঙ্গী হয়েছিলেন অ্যানড্রুজ। সীমানা পুলিশের উত্তর দিচ্ছেন ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান মেলানো খিচুড়ি ভাষায়। অ্যানড্রুজের দুর্দশায় মীরা কৌতুক অনুভব করছেন – হাসিঠাট্টায় কাটছে পথের ক্লান্তি। নীতুর কাছে পৌঁছে দেখলেন আগের চেয়ে ভালো। অসুস্থতার গুরুত্ব চেহারা দেখে বোঝা গেলেও, মুখশ্রী আগের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হল।

লাইপজিগের ডাক্তারদের পরামর্শেই নীতুকে নেওয়া হয়েছিল ব্ল্যাক ফরেষ্টে। পথে নীতু কষ্ট পেয়েছেন সে কথা লিখেছিলেন অ্যানড্রুজ। অসুখ বেশ জমে বসেছে – ব্রঙ্কাইটিস ও যক্ষা একযোগে আক্রমণ করেছে। রাজকীয় রোগের রাজকীয় খরচ। রবীন্দ্রনাথের পাঠানো টাকা পৌঁছেছে, নগেন্দ্রনাথ তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ি বেচে দিতে উৎসুক – এমনি কত খুঁটিনাটি খবরে এন্ডরুজের চিঠি ভরা। ২৯শে জুলাই এন্ডরুজ টেলিগ্রাম করলেন কবিকে,

"... সব ব্যবস্থা চলছে ঠিকমতো, টাকাকড়ির জন্য কোনো উদ্বেগ নেই, নীতু ভালো আছে"।...

এ টেলিগ্রামের উদ্দেশ্য কবিকে উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেওয়া। ৩০শে জুলাই চিঠি লিখলেন আবার,

"... স্যানাটরিয়মের ভিতরে আছেন মীরা আর নীতীন্দ্র, বাইরে নগেন্দ্র আর এন্ডরুজ। একটি ভিলাতে নীতুকে রাখার আয়োজন হয়েছিল – ডাক্তারদের পরামর্শে এনে রাখা হয়েছে স্যানিটোরিয়মে। খোলা বাতাসের দাক্ষিণ্যে সে সেরে উঠবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন স্যানাটরিয়মের প্রধান চিকিৎসক স্কিনডার"।...

অ্যানড্রুজ সাহেবের নতুন বই ভালো বিক্রি হয়েছে, সুতরাং আর ভাবনা কিসের। আনন্দে উৎসাহিত হয়ে অ্যানড্রুজ লিখলেন, "... গুরুদেব নভেম্বর পর্যন্ত টাকাকড়ির দায়িত্ব আমার, আপনি কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না"।... আনন্দে কল্পনাবিলাসী অ্যানড্রুজ লিখলেন, "... নভেম্বরে নীতু আর মীরা ফিরে যাবে ভারতে – জার্মানীতে যে তখন ভয়ানক শীত। উদ্বেগের কারণ নেই, সব ভালোর দিকে – My own place is here with Mira and Nit"।...

৩রা আগষ্টের চিঠিতেও সান্ত্বনা ছিল। আশ্বাস ছিল – নীতু ভালো আছে। ভরসা দিয়েছেন সেই অজানা করস্পর্শের যাতে সবই কল্যাণকর হয়। ভয় নেই। অ্যানড্রুজ কবিকে লিখলেন, "... অবস্থা গত সপ্তাহের চেয়ে ভালো"।...

কিন্তু এই সান্ত্বনা থাকল কই! সব আশা চূর্ণ করে এক্স-রে রিপোর্টে দেখা গেল আর কোনো উপায় নেই। ২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট সকালে হতচেতন নীতুকে যেন মৃত্যু স্পর্শ করে গেল। ক্রমাগত অক্সিজেন দিয়ে কোনোমতে জীবনের রেশটুকু ধরা রইল। আশা নেই, আর কিছুই করবার নেই। মানুষ যে কত অসহায়, অশ্রুব্যাকুল ভাষায় অ্যানড্রুজ কবিকে তাই লিখলেন। কবির ভাষাতেই বললেন,

"... there must be some meaning behind pain"...

"... এত বেদন হয় কি ফাঁকি।

ওরা কি সব ছায়ার পাখি।

আকাশ – পারে কিছুই কি গো বইল না –

সেই – যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"।।

চিঠির শেষে একটি পরম সান্ত্বনাবাক্য – বহুদূরের বৃদ্ধ দাদামশাইকে সান্ত্বনার শেষ প্রলেপ –

"... নীতু সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি – Nitu is so brave"।...

তার পরদিন ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট ১৯৩২। যে শ্রাবণে সূর্য হারায়, আঁধারে পথ ভোলে আকাশজোড়া তারার মিছিল, সেই শ্রাবণ ফিরে এলো। না, যে লক্ষণ রোগ মুক্তির ইঙ্গিত বলে মনে হয়েছিল তারা ভুল ইশারা করেছিল। সাধারণ নয়, রোগটা আসলে ছিল গ্যালপিং টি.বি.।

মৃত্যুর আগের রাত্রিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নীতু। কিন্তু তখনও সাহসী মন তাঁর সংগ্রামরত। কোনো গুরুতর যন্ত্রণার অভিযোগ তাঁর ছিল না। ডাক্তার জানিয়ে দিলেন যে কোনো মুহূর্তে শেষ ডাক পৌঁছাতে পারে। মীরা চেষ্ঠা করলেন পরম আদরে নীতুকে দুধ খাওয়াতে। নীতু বলেছিল 'কাল সকালে খাব'। সে সকালও এলো, কিন্তু দেনাপাওনা সব মিটে গেছে তাঁর। মার সঙ্গে সেই তাঁর শেষ কথা।

দূরে বহুদূরে কলকাতার বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের বাসভবনে কবি অপেক্ষা করে আছেন। মনে মনে আশা নীতু ভালো হবে। ২৩শে শ্রাবণ রয়টারের খবর বেরুল পত্রিকায়। প্রশান্তচন্দ্র ফোন করে খড়দা থেকে আনালেন রথীন্দ্রনাথকে। দুজনে গিয়ে দাঁড়ালেন কবির সামনে। নীতুর খবর এসেছে শুনে প্রথমে প্রশ্ন করলেন, ভালো খবর কি না। শুনলেন ভালো নয়। বুঝে নিতে দেরি হল না। নির্দেশ দিলেন প্রতিমাদেবীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে, নন্দিতা ওখানে একলা আছে। খবর পাবার পনের দিন পর তিনি 'ধাবমান' কবিতা লিখলেন,

"... বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ্ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে"?

এই সময়ে তিনি 'পুনশ্চ'-র কবিতাগুলি রচনা করেছেন, বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য কবিতার জন্ম হচ্ছে। যেদিন নীতীন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছাল, সেই দিন রচিত হল 'বীথিকা'-র অন্তর্গত 'মাতা' কবিতাটি,

"... বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন;
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন –
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন"।

যে গ্রামে স্যানাটোরিয়ম সেই গ্রামেই নীতীন্দ্রের দেহ রক্ষিত হল মীরাদেবীর ইচ্ছানুযায়ী। পুত্রকে সাজিয়ে শেষ বারের মতো দেখে বিদায় দিলেন। শেষ যাত্রায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে চলেছিলেন অ্যানড্রুজ। স্কোমবার্গ থেকে কবির কাছে অ্যানড্রুজের শেষ চিঠি এলো,

"এই গ্রামের মানুষ যেখানে শেষ আশ্রয় পায় সেই সমাধিক্ষেত্রে নীতুকে রেখে এসেছি। সব কাজ সারা হলো। চারিদিক থেকে প্রকৃতির রূপ এমন করে আর কোথাও খোলেনি। সামনে পাইনের বন, বাতাস গান গেয়ে চলেছে ক্রমাগত। ঠিক এরই মধ্যে নীতুর মরদেহ শায়িত হলো। ফুটে ওঠা ফুলে তাঁর সমাধি ঢেকে গেছে। পায়ের দিকে একটা ছোটো গাছের কচি শাখা দুলছে। গরমের দিনে এতে ফুল ফুটবে, এখন লাল লাল ফল পাখিদের তৃপ্ত করছে। দূরে উপত্যকার শেষে ছড়িয়ে রয়েছে শ্যামল বনাঞ্চল আর নীচে পাহাড়ের সংলগ্ন গ্রামের গির্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়ে। তোমার নিজের হাতের একটি লেখা সম্বলিত নন্দলাল পরিকল্পিত একটি পিতলের ঢাকা এই সমাধির জন্য চাই। সেই স্মারকলিপিটি জার্মানির বুকে দুই দেশের মানুষের ভালবাসার চিহ্ন হয়ে থাকবে"।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নীতীন্দ্রকে লেখা কবির আটটি চিঠিপত্র-এর চতুর্থ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে, প্রত্যেকটিতেই আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে। নীতীন্দ্রর জন্য, তাঁর মা'র জন্য তাঁর বহন করা প্রচন্ড উদ্বেগের প্রকাশ নেই কোনোখানে। রসিকতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, নাৎসি 'মানুষখেকোদের দলে' মিশতে বারণ করেছেন, বাদ্যযন্ত্র বা ছবি আঁকা শিখতে উৎসাহ দিয়েছেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন। কোথাও তাঁর অসুখ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন নি – অথচ তিনি সবই জানতেন। এমনকি মীরাদেবী যখন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে জার্মানি যাচ্ছেন ধীরেন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গে, তাঁর হাতে নীতীন্দ্রকে যে চিঠি পাঠালেন তাতেও আছে আশ্বাস আর রসিকতা। ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ নীতুকে লিখেছিলেন,

"... নীতু এই চিঠি তোর মায়ের হাতে দিচ্চি। তুই অনেকটা ভালো আছিস শোনা গেল – এইবার তোর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবি। হাওয়া বদলের জন্যে কোথায় তোকে নিয়ে যাবে এখনো খবর পাই নি। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর জায়গা হবে, তোর লাইপজিগের চাইতে অনেক ভালো। আমার যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কাজকর্ম ফেলে যাবার যো নেই। এর পর আসছে বছরে কোনো এক সময় হয়তো দেখবি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। ... আমার দুই একটা বই তোকে পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। এতদিনে জার্মানের চাপে বাংলা ভাষা যদি না ভুলে গিয়ে থাকিস তাহলে যখন খুশি একটু আধটু করে পড়িস – কিন্তু কবিতা লেখবার চেষ্ঠা করিসনে"। ...

কিন্তু এই বেদনার আঘাত কি পরম শক্তিতে তিনি জয় করলেন। যে শোক পেলেন তার 'ঠিক মানেটা' মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন, কিন্তু কোনো কাজে কোনো আনুষ্ঠানিকতায় সে শোককে প্রকাশ পেতে দিলেন না। শোক যে একান্ত তাঁরই, অনুষ্ঠানের কোলাহলের জিনিস তো তা নয়। মীরাকে লিখলেন,

"... নীতুকে খুব ভালোবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকান্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ... অনেকে বললে এবার বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক – আমার শোকের খাতিরে – আমি বললাম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব – বাইরের লোক কি বুঝবে তার মানেটা"। ...

মনে পড়ল অনেক দিনের পুরোনো কথা। একদিন অকস্মাৎ ফাঁকি দিয়েই চলে গিয়েছিলেন শমীন্দ্রনাথ কারও সেবার অপেক্ষা না রেখে। সেই পুরোনো ব্যথার তন্ত্রীতে নতুন করে আঘাত লাগল নীতীন্দ্রের চলে যাওয়া উপলক্ষ্য করে। ওই চিঠিতেই মীরাকে লিখলেন,

"... যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেছি, আমার তো আর কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক"। ...

মনে পড়েছিল শমীন্দ্রের মৃত্যুর পরের রাত্রে কেমন জ্যোৎস্নায় ভেসে গিয়েছিল চারিদিক। কোথাও তো কিছু কম পড়ে নি। নীতুর প্রসঙ্গেই লিখলেন 'বিশ্বশোক', সেখানেও কথাটি একই,

"দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি –
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না"।...

২১শে শ্রাবণ কবির যেন শেষ কথা জানা হয়ে গিয়েছিল। মীরাকে মনে রেখে 'দুর্ভাগিনী' কবিতায় লিখেছিলেন মেয়ের দুর্ভাগ্যকে কাব্যবস্তু করে,

"... সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে;
খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে,
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে"।...

কেন এই নিস্ফলতা, এক একটি জীবন কেন এমন বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। জীবন যখন এমনি আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয় তখন আর সব হারানোর দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়, চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয় বিশ্বাসের সংকট – ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে পড়া বিপুল বিশ্বাস। কন্যাকে (বেলা) সম্বোধন করে বলেছেন 'বেদনার মহেশ্বরী' – কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো বাক্যেই সান্ত্বনা মানেনি মন। নিরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে – ঘরে ঘরে প্রতিদিন অনর্থক মৃত্যুর খামখেয়ালী আচরণের যে প্রতিবাদ জাগে পুত্রহারা জননীর কণ্ঠে তারই কালজয়ী কাব্যরূপ এ কবিতার শেষে, –

"... তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন –
কেন, ওগো কেন"!

২২শে শ্রাবণ ১৩৩৯, (৭ই আগষ্ট ১৯৩২) যে মৃত্যু নিয়ে এলো, সে কবির পক্ষে পরম যন্ত্রণার, কিন্তু তবু কবি সেদিন নিজেকে স্থির রেখে বলতে পেরেছিলেন,

"... যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পর্ণ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে"।...

এই সময় থেকে তিনি নিজের নামের আগে 'শ্রী' লেখা বর্জন করেন। ১৩৩৯ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী-তে তাঁর যে-কটি লেখা প্রকাশিত হল সবগুলিই 'শ্রী' হীন, এর পরে আর কখনো 'শ্রী' ব্যবহার করেন নি। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। উৎসর্গ করলেন নীতীন্দ্রনাথের নামে।

ঋণ: রবীন্দ্র জীবনী – প্রশান্ত কুমার পাল

রবীন্দ্ররচনাবলী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন – সমীর সেনগুপ্ত

তবে তাই হোক – সৌমেন্দ্রনাথ বসু

Indrajit Sengupta – Working in Larsen & Toubro as a Sr. Manager (EHS- Environment, Health & Safety). Already published 2nos. of Kabya Grantha "Nepathyacharini" & "Ogo Bideshini". "Nepathyacharini" consist of so many poems with the relationship of Togore, Like Anna Tarkhar, Kadambari Devi, Luci, Victoria, Indira, Tomi, Ranu, Hemantabala, Maitreyi etc. "Ogo Bideshini" Consist of so many poems with the relationship of Tagore like Olga Lorenza, Clara Butt, Butension, Harriet Monro, Helen Kellar, Nivedita, Harriet Moody, Miss Jen, Sinclair, etc.

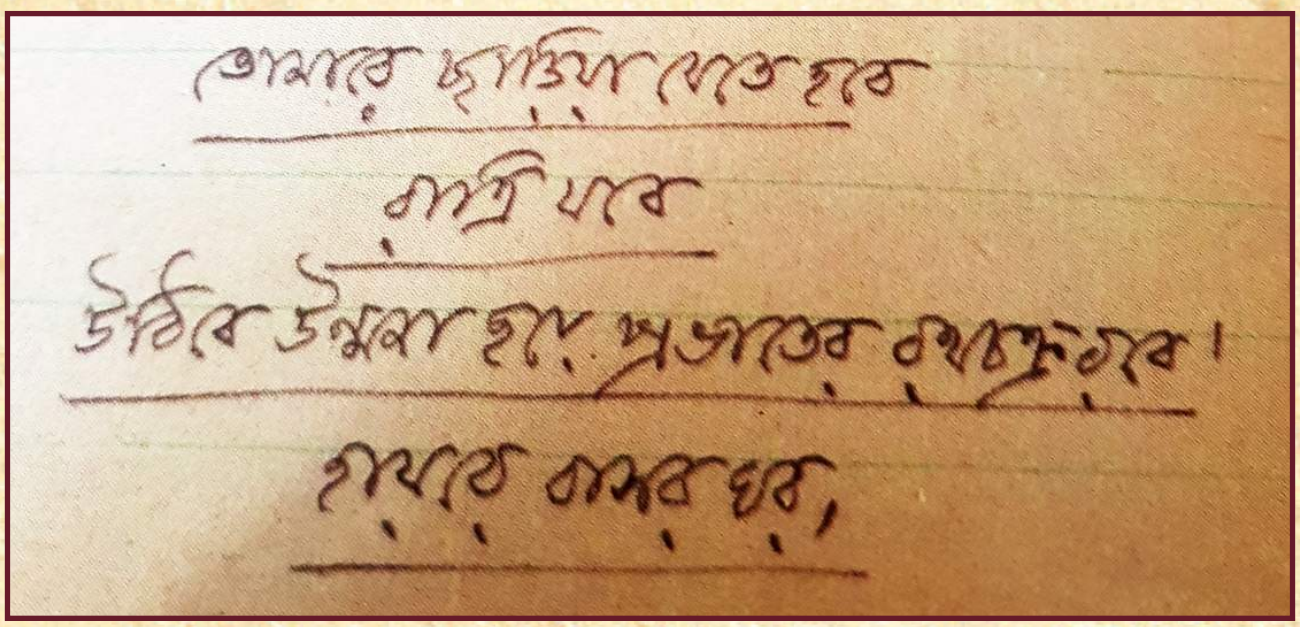

সৌমিক ঘোষ

আমার সহজপাঠ

নোবেল জয়ের ঈষৎ আগে কিংবা ঈষৎ পরে
তোমায় আমি দেখেছিলাম 'সহজ পাঠের' ঘরে
সহজ করে শিখিয়েছিলে কলিকাতার চলা
হাওড়ার ব্রিজকে 'বিছে' বলে কল্পনায় ধরা –

ছায়ার ঘোমটা টানা পাড়া –
বিধু গোয়ালিনীর দোয়া দুধ –
অথবা নদীর গল্প চলে আঁকে-বাঁকে
বৈশাখের হাঁটুজলে, বালি চিকচিকে
খরতর ধারা নদী আষাঢ়ের মাসে
ঋতু যায়, ঋতু আসে – পরিচিত ছকে
কল্পনায় সাঁতরেছি সেই নদীর জলে
তোমার চোখে দেখেছিলাম পল্লীবাংলাকে

পাতা ঝরানোর মরসুম – ঘাসে শিশিরবিন্দু পড়া
বর্ষা শেষে কেমনে পেয়েছে মেঘের দলেরা ছাড়া
"কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে"
মাত্রাবৃত্র দুই না তিন ! আসেনি প্রশ্ন মন-ঘরে –

ভোর হলে লোকা ধোবা গাধা নিয়ে আসে
গাধা বসে ছোলা খায় কোঠাবাড়ির পাশে
এসব দৃশ্য একটা জীবন আমার চোখের পাতায়
ঘোর লাগায়, মন্থরিত সময় – সহজপাঠের কথায়

জল মেলে ধোয়া ডানা হয়ে যায় পাখি
চেয়েছি যেখানে পেয়েছি তোমায় বন্ধ করলে আঁখি
সহজপাঠ থেকেই শেখা সহজপাঠেই চলা
সহজ পাঠের পাতায় বাঁচুক আমার ছেলেবেলা।।

সৌমিক ঘোষ – সিডনী নিবাসী তরুণ এই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারটি পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকেও খুঁজে নিয়েছেন, নিজের জন্য এক অন্য আকাশ, অন্য পরিচয় . . . গীতিকার ও নাট্যকর্মী । তাঁর কবিতাতেও তাই গীতিময়তার আভাস, নাটকের দৃশ্যমানতা। প্রথম প্রকাশ সাঁঝবাতি পত্রিকায় ২০০১সালে ।

বিশ্বদ্বীপ চক্রবর্তী

আমার গানের ওপারে

আমি দুঃখিত ম্যাডাম, দেখা করা সম্ভব নয়। কাউকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

ফোনের ওধারের নিঃশব্দ কান্না আমাকে চুড়চুড় করে দিচ্ছিল। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে না গেলে কোন স্পেশাল পারমিশানও করাতে পারবো না। আমার দিক থেকে চেষ্টা করেছিলাম। দুজনের ভিডিও চ্যাট করিয়ে দেখেছি, কিন্তু ভদ্রলোক কোনরকম সাড়া দেওয়ার অবস্থায় নেই। কি লাভ !

জানেন, একবার যদি ওকে ছুঁতে পারতাম, একবার ! আমি নিশ্চিত ও সাড়া দিত। ফিসফিস করে বলছিলেন উনি অন্যদিক থেকে। ভাঙ্গা গলাতেও কি এক অদ্ভুত বিশ্বাস।

আমার আবার ডাক পড়ছে, ফোন রেখে যেতেই হবে। ওনাকে কিভাবে শান্ত করবো বুঝতে পারছিলাম না। স্বান্তনা দিতে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কিছু বিশেষ কথা আছে অথবা কোন প্রিয় গান ?

ভদ্রমহিলার গলায় যেন হঠাৎ কেমন শক্তি এসে গেল। ওকে শোনাবেন ?

অবশ্যই। আপনি বলুন, আমি রেকর্ড করে নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি আমি ওনাকে শোনাবো।

গলার মেঘ সরিয়ে দিয়ে উনি গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, গলাটা ধীরে ধীরে উঠছিল –

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে

আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।

কোনমতে রেকর্ড করে দৌড়ে চলে গেছিলাম তখন।

এরকমভাবে শুনিয়েছি আরো দুই একজন রোগীকে আমার ফোন থেকে। কিন্তু আইসিইউতে অচেতন শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিলাম না, লাভ হবে কিনা। বাইশ দিনের উপর আছেন উনি। ধীরে ধীরে অবস্থা খারাপের দিকেই চলেছে। কথা দিয়েছি যে। ফোনটা জিপলকে রেখেই বুড়ো আঙুল দিয়ে আনলক করে চালিয়ে দিলাম।

মনিটর বিপ বিপ করছিল। ভদ্রলোক ভেন্টিলেটার থেকে হাওয়া টানতে চাইছেন। আমি ডানদিকে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ভদ্রলোকের চোখ ডানদিকে ঘুরে গেল। গান চলছিল –

দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে

আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।

তাহলে কি উনি শুনতে পাচ্ছেন, রেসপন্ড করছেন নাকি ? অবিশ্বাস্য ! আমি তাড়াতাড়ি করে বিছানার বাঁ দিকে চলে গেলাম। মোবাইলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ বাঁ দিকে ঘুরে গেল। এতো অসম্ভব ! দৌড়ে পাশের ঘরের নার্সকে ডেকে আনলাম। আমি কি ঠিক দেখছি ?

একদিন বাদেই ওনার ভেন্টিলেটার সরিয়ে নেওয়া গেছিল।

ডুবে যাওয়ার অতল থেকে যখন এভাবে একেকজন ভেসে ওঠেন, নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আনার মতই আনন্দের সে মুহূর্ত !

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী — পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক। প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন। গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে। মঞ্চসফল নাটক 'রণাঙ্গন' — এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে। ধারাবাহিক উপন্যাস 'হাগা সাহেবের ট্রেন' প্রকাশ পাচ্ছে 'অন্যদেশ' ওয়েবজিনে। থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে।

সঙ্গ নিঃসঙ্গ

'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে এই হলো কবির এক দিনলিপির সূচনা। এক হিসেবে, এ তো শিল্পীমাত্রেরই ভাগ্য, ভিতরে ভিতরে এই নির্জন নিঃসঙ্গতা। হয়তো আমরা সব সময়ে মনে রাখি না যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই একলা-সাগরে ভাসমান। তাঁর ব্যাপৃত মূর্তি, কাজকর্মে তাঁর চঞ্চল পরিচয় এতটাই আমাদের চিত্ত অধিকার করে থাকে যে সহসা আমরা দেখতে পাই না ভিড় থেকে তাঁর পালিয়ে যাবার না-নৌকোটিকে, আমরা জানতে পাই না যে এই নির্জন ভেলাটি সব সময়েই চলছে তাঁর রচনাজীবনের গোপনে গোপনে। 'গীতিমাল্য'-র একটি গানে যে অনেকদিন আগেই তিনি লিখেছিলেন 'ভেলার মতো বুকে টানি / কলমখানি / মন যে ভেসে চলে' তা আমরা লক্ষই করিনি তত। এই কলমের ভেলা নিয়ে নিঃসঙ্গ ভেসে যাওয়া কবি : এই হলো তাঁর এক পরিচয়।

— ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ — শঙ্খ ঘোষ

শুভ্র দাস

আমার রবীন্দ্রনাথ

কিছুদিন আগে মধুরিমাকে নিয়ে কাবুলিওয়ালা দেখতে বসেছিলাম। সিনেমার শেষের দিকে রহমতের দুঃখে বাপ মেয়ে দুজনেই খুব কাঁদলাম। ও আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলো, আমি ওর ।

আর একদিনের কথা, অফিস যাচ্ছি। সেদিন আমার বস, মানে কলেজের ডিন-এর সাথে দেখা করবার কথা। এমনিতেই আমাদের সম্পর্ক ভালো নয়, এই মিটিং'এ কিছু তর্ক বিতর্ক, ঝগড়া ঝাঁটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মনটা চাঙ্গা করার জন্য গাড়িতে রেজওয়ানার কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীত শুনে নিলাম। "আসা যাওয়ার পথের ধারে" শুনে মনটা কৈশোরের এক শীতের দিনের দুপুরে গিয়ে হাজির হলো। এরপর যখন ডিন-এর সঙ্গে মিটিং শুরু হলো তখনই বুঝলাম যে ওর কথাগুলো শুধু এক কান দিয়ে ঢুকছে আর অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আর কেন জানি না কানের মধ্যে একটা লাইন বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে "মরণ এলে হঠাৎ দেখি, মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় "বীরপুরুষ" কবিতায়। আর পাঁচজনের মতো ওটা আমার মায়ের খুব প্রিয় কবিতা। আমার মা আমার বছর চারেক বয়সে ওটা মুখস্ত করিয়েছিলেন স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবার জন্য। স্টেজে দাঁড়িয়ে "এমন সময়, হা রে রে রে রে ..." বলতে বলতে স্টেজের ডানদিকে চোখ চলে যেতে দেখলাম সঞ্চয়িতা হাতে লুসি দিদিমনি দাঁড়িয়ে আছেন – ভুলে গেলে প্রম্পট করবেন বলে। আমার বাবা-মায়ের বিয়েতে পাওয়া সেই সঞ্চয়িতা এখন আমার কাছে। এখনো "হা রে রে রে ..."-র সাথে সাথে লুসি দিদিমনির মুখ চোখে সামনে ভেসে ওঠে – যেন দাঁড়িয়ে আছেন জীবনের স্টেজের পাশে, সাহায্যের হাত বাড়াবেন বলে।

আর একটু বড় বেলায় আমি পড়তাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। অন্য বাচ্চারা যখন "আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে," কিংবা "কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি" পড়ত তখন আমি পড়তাম অনিল, কান্তা ও মহিন্দর-এর কথা। তারা থাকতো নাইরোবিতে। ওই বয়েসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় কতকটা অপরিচয়ই বলা যেতে পারে। যখন আর সবাই রবিঠাকুরের লেখা পড়ছে আমি তখন পড়ছি "নাই-রবির" কথা।

ঠিক এই বয়েসেই আমার বন্ধু মুনের বাড়ি গিয়েছি একদিন। বোধহয় সেদিন ছিল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করছিল ওরা। বড়, ছোট সকলে মিলে আমাকে ধরলো কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য। আমি যত বলতে লাগলাম আমি কোনো কবিতা জানি না, তবুও কেউ আমার কথা শুনলো না। বার বার মনে হতে লাগলো এরা তো আর কাউকে এরকম জোর করছে না, তবে আমাকে কেন ? শেষ পর্যন্ত্য যখন আমাকে বলতেই হলো তখন রবিঠাকুরের বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় "twinkle twinkle litte star," আবৃত্তি করে দিলাম। যে যাই বলুক এর পর আর কেউ আমাকে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করবার বদনাম দিতে পারবে না। স্কুল জীবনের দু-একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ইংরাজির শিক্ষক ছিলেন Thomas Dias নামে এক ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। মাঝে মাঝই চোখ পাকিয়ে টেগোর টেগোর করতেন আর "Where the mind is without fear" আবৃত্তি করতেন। একবার বাংলা ব্যাকরণ পড়াতে পড়াতে মল্লিক স্যার কিসের যেন একটা উদাহরণ দিতে দিতে বলেছিলেন, "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো।" নিজের অজান্তেই ফ্যাক করে হেসে ফেলেছি জোর আওয়াজ করে। মল্লিক স্যার আমাকে পছন্দ করতেন খুব। এই হাসি যার তাকে এক চড় মারবার জন্য এগিয়ে এসে উনি যখন দেখলেন আমি হেসেছি তখন বড়োই অসহায় আর করুণ হয়ে গিয়েছিলো ওনার মুখ। বাংলা ব্যাকরণ কিছু শিখিও নি । কিন্তু ওই লাইনটা শুনলে আজ মল্লিক স্যার-এর রাগী অথচ অসহায় মুখটা মনে পড়ে যায়।

আর একটু উঁচু ক্লাসের কথা। তখন আমাদের নাটক করার খুব উৎসাহ। আমার বন্ধু শিবাজী একদিন একটা নাটক নিয়ে এল। নাটকের নাম পোস্টম্যান। বললো উঁচু ক্লাসের একটা ছেলের লেখা। আমরা অনেক রিহার্সাল দিয়ে ওই নাটক মঞ্চস্থ করলাম স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। অনেকে বাহবাও দিলেন। পরের বছর বাংলা পাঠ্য বই রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি" পড়তে গিয়ে দেখি পাতার পর পাতা কিরকম চেনা লাগছে। বুঝলাম রঘুপতির গলায় তখন নতুন করে শুনছি পোস্টম্যান নাটকে সাধুবাবার বেশে শিবাজীর সমস্ত ডায়লগ। রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময় প্রতি বছর আমি মামাবাড়িতে থাকতাম। সেখানে আমার দিদি-মাসিরা মিলে রবীন্দ্র জয়ন্তী করা হত। অনেকদিন ধরে চলত রিহার্সাল। আসল দিনে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া হত। হারমোনিয়ামে-এর প্যাঁ প্যাঁ শব্দের সাথে সুরে বেসুরে গলা মিলিয়ে আমরা গেয়ে উঠতাম – "এস হে বৈশাখ।" অনেকক্ষণ চলত এই অনুষ্ঠান। সবশেষে আমার দিদিমার সৌজন্যে থাকত এলাহি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। নাচ, গান, কবিতা, ফুল, ধূপ, সিঙ্গাড়া, লুচি, আলুর দম, সব মিলিয়ে একাকার হয়ে যেত আমাদের বড় হয়ে ওঠা।

রবীন্দ্রনাথের "ছুটি" গল্পের তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেটির মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার হাত ধরেছিলো মনুমামা। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে সমান দক্ষ ছিল ও। সমান দক্ষতা ইংরিজি ও বাংলায়, নাটকের দল ছিল, আবৃত্তির খৈ ফুটতো মুখে। ওর জন্মদিনও ছিল পঁচিশে বৈশাখ। তাই মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে বলতো যে রবি ঠাকুর famous হয়ে গেলো ওর জন্মদিনের দিন জন্মে। রবীন্দ্রনাথ ও তার প্যারডি মুখে মুখে ঘুরতো। তাই আসল কবিতার সাথে সাথেই শুনেছি:

"আজিকে তোমার বিধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে

হে মাতো বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ভরে গেছে খানা ডোবাতে

বহিতে পারে না দেহে জ্বর ভার,

পেটে পেটে পিলে ধরে নাক আর,

দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল বিজন পল্লী সভাতে

একপাশে তুমি কাঁদিছ জননী, শরৎ কালের প্রভাতে।"

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বলে থেমেছিল ও। মনুমামার হাত ধরেই আমার পরিচয় শম্ভু মিত্র'র নাটক ও আবৃত্তি, দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত এবং স্কুলের পাঠ্য বইয়ের বাইরের জগৎ। আমার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বন্ধুরা যখন পড়ছে Alistair McLean কিংবা Robert Ludlam, আমি তখন ভাবছি ঘরে বাইরের নিখিলেশ না সন্দীপ, কে বেশি পছন্দের ? গোরার সুচরিতা না ললিতা – কাকে ভালবাসবো ?

মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়েসে চলে গেছে মনুমামা। আমার সঙ্গে শেষ দেখা Stateman অফিসের উঁচু ঘোরানো শ্বেত পাথরের সিঁড়ির ওপর। আমি তখন এদেশে আসব, দেখা করতে গেছি। ও ছিল তিন তলার ওপর সিঁড়ির রেলিং দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। আমি নীচে, ওপর দিকে তাকিয়ে। আমাকে বলেছিলো "time flies, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।" রবীন্দ্রনাথের "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে" গানটা আমার খুব প্রিয়, আমি প্রায়ই শুনি। কারণ ওই গানটা শুনলেই এখনো আমার চোখের সামনে দেখতে পাই সেই জায়গা, সেই সিঁড়ি, আর হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মানুষটাকে।

এই সব নিয়েই আমার রবীন্দ্রনাথ। আমার রবীন্দ্রনাথ "হা রে রে রে"-র সময় জীবনের স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লুসি দিদিমনি। সুরে বেসুরে "এস হে বৈশাখ" গাইতে গাইতে, বছর বছর রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করতে করতে আর পাঁচজনের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠা। আমার রবীন্দ্রনাথ Dias স্যারের চোখ উল্টে টেগোর টেগোর বলতে বলতে "Where the mind is without fear" আবৃত্তি। আমার রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা দেখতে দেখতে বাপ মেয়ের কান্না। আর সর্বোপরি আমার রবীন্দ্রনাথ জীবন-মরণের সীমানার সামনে, হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, শ্বেত পাথরের সেই ঘোরানো সিঁড়ির ওপারের মানুষটা ।

শুভ্র দাস – গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী। পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারং-এর প্রফেসর। জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায়। পড়াশোনা খড়গপুর আই. আই. টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখালেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিক্স। বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে।

"মনে হয় যেন আর জন্মের কথা। সেই নিমগাছের তলা। মণি পরেছিল কুসমি রঙের শাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নিচু করে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বৌ কথা কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে – সে কী হাওয়া, আর ঝাউগাছের ডালে ডালে কী ঝরঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শুঁকছিল – বলে আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তার যে কী ভালো লাগে না, তা জানি নে। তারই ভালো ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা আমি অনেক ভোগ করেছি।"

গৃহপ্রবেশ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবীপ্রিয়া রায়

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু মন

রবি ঠাকুর কবে থেকে তোমাকে চিনলাম বলো দেখি ? পারলে না তো ? আমিও পারিনি-অনেকক্ষণ ভাবলাম, কিন্তু প্রথম আলাপের মূহুর্তটা কিছুতেই মনে এল না, বুঝলে ? আসলে আমার ডাকনাম তো মিঠু। তা সেই যবে থেকে নিজের নামে সাড়া দিতে শিখেছি, তখন থেকেই ফুলপি মানে ছোটপিসী চোখ টান করে বলতেন যে, 'তোর নামটা আমি দিয়েছি। রবি ঠাকুরের নাতনির নাম শুনে।' তাই তোমার নামের সাথে পরিচয় তখনই হয়েছে বলতে হবে। তুমি যে একজন কেউকেটা লোক সেটা তখনি বুঝেছিলাম, তবে কবিতা লেখ না গল্প তখন কি বা জানি। তারও কয়েক বছর পর হতে তোমার কবিতা পড়া আর বলা শুরু-ভাব বুঝতে শিখি নি, ছন্দের দোলায় মনটা দোলে। আমি যে ছোটো একটা মানুষ — শুধু আমার মত ছোট্টোদের জন্য যে তুমি কতকিছু লিখেছ অতশত বুঝতাম না। কিন্তু একপেয়ে তালগাছ-এর একা একা দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভাবা, কিম্বা ছোট নদীর এঁকেবেঁকে চলার কথা পড়তে পড়তে বা বলতে গিয়ে মন-এর মধ্যে দিয়ে ছায়াছবির মিছিলের মত ছবি আনাগোনা করত, শিশুর চোখে এই ছবি এঁকে দেওয়াতে তোমার যে কত মুন্সীয়ানা সে হিসাব করার বুদ্ধি তখন ও হয়নি। আরেকটু বড় হয়ে পড়লাম শিশু। বিজ্ঞ কবিতাটি পড়ে হেসে লুটোপুটি খেলাম। ঠিক আমার ছোট ভাইবোনদের মত বোকা একটি বোন নিয়ে দাদার ভাবনা চিন্তার দেখি শেষ নেই। কেমন বলছে —

''খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝে
আমরা যখন উড়েয়েছিলেম ফানুস।
আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো করে মুখে দেয় মা, পুরি।
সামনেতে ওর শিসুশিক্ষা খুলে
যদি বলি, খুকি, পড়া করো
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।''

— ভাবি ইস্ রবিঠাকুর তুমি কেমন করে জানলে যে ভাইবোন-এরা এমনি বোকা হয় ! তখন তো জানিনা যে তুমি নিজে শিশু হওয়ার সাধনা করেছ বরাবর, তাই 'শিশু ভোলানাথে' লিখে গিয়েছ —

''বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।

মন্ত্রণা দেয় কতজনা,

সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা,

পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি ।

শিশু হবার ভরসা আবার

জাগুক আমার প্রাণে,

লাগুক হাওয়া নির্ভাবনারপালে''

ছোটবেলায় তোমার মা তোমায় ছেড়ে গিয়েছিলেন, তাই বুঝি তোমার মাঝে চিরকাল লুকিয়ে থেকেছে মা'কে খুঁজে ফেরা অসহায় একটি শিশু । শুনেছি ছেলেবেলায় তোমাকে তোমার পাহারাদার চাকরটি গন্ডী টেনে বসিয়ে দিত আর বলত, 'এর বাইরে বের হলেই বিপদে পড়বে' । সীতার গন্ডি পার হওয়ার বিপদের কথা ভেবে তুমি আড়ষ্ট হয়ে সেইখানে বসে দীঘির ধারে বটগাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে । মা হারা সেই একা বালকটি হয়তো কখনো সেই একাকিত্ব ভোলে নি, যেমন যায়নি তার মন থেকে মা হারাবার বেদনা । তাই তুমি যেদিন আর বালক নেই, অনেক বড় হয়ে গিয়েছ, সেদিনও লিখেছ –

'মাকে আমার পড়ে না মনে - - - -

তোমার মনের ছোট্ট শিশুটি কেবল মায়ের সাথে একা একা লুকোচুরি খেলে গেছে । মা'কে সে বলে

সন্ধে হলে মেঘেরা নাম ধরে তাকে ডাকে,

কিন্তু কল্পজগতে সেই মেঘেদের ডাক শুনেও সে যেতে পারে না । শুধু বলে,

'মা যে আমায় ডাকে –

''কেমন করে ছেরে থাকব তাকে ।

শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে ।

তার চেয়ে মা, আমি হয় ঢেউ,

তুমি হবে অনেক দূরের দেশ ।

লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,

কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ ।''

একদিন আমিও আর শিশু রইলাম না, বড় হয়ে গেলাম । বড় হতে হতে কত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তোমার কবিতা বলে পুরস্কার পেলাম, খাতার পাতায় কত ভাব সম্প্রসারণ করে ফেল্লাম আর তারই মাঝে কখন যেন তোমার সাথে আমার নিজের মতন করে একটা ভাব হয়ে গেল । আমি তখন সব মনের ভাবেই তোমার সাড়া পাই, কিন্তু তবু দেখি সেই ছোট্ট ছেলে তোমার লেখার মাঝে যখন তখন উঁকি দেয় । শুধু তাই নয়, তোমার যত দুষ্টু ছেলেদের সাথে ভারি ভাব । হবে নাই বা কেন ? তুমি নিজেও বোধহয় বেজায় ফাজিল আর দুষ্টু ছিলে, তাই ছেলেবেলায় লিখেছ –

বস্তুত, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে-ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা আমাদের ঠিক সে-ভাবে দিন কাটে নাই । আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মতো ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে । তাহারা খুব যে বেশি ভালোমানুষ ছিল, তাহার প্রমাণ নাই । শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ-বারো ছিল তখন তাঁহারা কেবলই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই কারণ, শিশুচরিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন । তাহার মতো প্রামাণিক শাসত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই । – সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া । সেই আঘাতে ভিতরে যে-জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা

নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব-একটা নাড়া দিয়াছে।

এই দুষ্টুমিকে বুঝতে বলেই তো তোমার শারদোৎসব শুরুই হয় দামাল ছেলের দলের দুষ্টুমি দিয়ে, গুরুজনেরা যা মোটেই সমর্থন করবেন না।

''ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বারিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে। লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো, একটাকেও ছাড়িস নে। একজন বালক। (চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে কলম টানিয়া লইয়া) কাক লেগেছে লক্ষ্মিপেঁচা লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

কত আর বলব রবি ঠাকুর। তোমার সাথে কথা বলতে গেলে কথাই ফুরোয় না। তবু একটা কথা না বললেই নয়। তোমার একটি গল্প আমি পড়তে পারি না। ভাল লাগে না। না-না-গল্প খারাপ বলছি না। তোমার অন্য সব গল্পের মতই এটিরও তুলনা নেই। তবু আমি পড়তে পারিনা। আজ তোমার সাথে কথা বলব, তাই মনকে ভুলিয়ে পাতা উল্টে তাকে খুঁজে বের করলাম। গল্পটি হল, 'ছুটি'। ফটিক বলে দুরন্ত ছেলেটি, যাকে তার বিধবা মা সামলাতে না পেরে তার মামার জিম্মায় কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে সেই দামাল ছেলেটির সকলের কাছে গালমন্দ খেয়ে মায়ের জন্য আকুতি কেমন হয়েছিল, তা তোমার ভাষাতেই বলি –

বিশেষতঃ তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগেনা। স্নেহও উদ্রেক করেনা, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ মনে করে। তাহার শৈশবের লালিত্যর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে অপরাধ না দিয়া থাকিতা পারেনা। শৈশব ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হিয়া থাকে। অথচ এই বয়েসেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা ও ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।'

কেমন করে এই বয়সের ছেলেটার দুঃখ তুমি বুঝেছিলে রবি ঠাকুর ? তুমি তো জমিদারের ঘরে সবার ছোট ছেলে ছিলে ! তোমাকে তো কারুর গঞ্জনা দেওয়ার কথা নয়। তবু যখনি পড়েছি, মনে হয়েছে যে এ শৈশবে মা হারানো এক সদ্য কিশোরের বেদনা। সে বেদনা তুমি সারা জীবন বুকের মাঝে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ, তাই না ? তাই জন্য এমন তীক্ষ্ণ মর্মস্পর্শী কলমের আঁচড়ে ফটিকের বোবা যন্ত্রণাকে তুমি এঁকেছ, যে মা তাকে মামার সাথে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছে 'সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা-কেবল কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মত কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন সেই লজ্জিত, শীর্ণ, দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।'

প্রতিটি শব্দে যেন আমাদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা চিরকালীন শিশুর মা'র কাছে যাওয়ার আকুলতা বুকের মাঝে ঢেউ দেয়। ফটিক সেদিন মায়ের কাছে বাড়ী যেতে চেয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল ছুটি না হলে সে মায়ের কাছে যেতে পারবে না। অথচ ইস্কুলের পড়া সে পারছিল না। তার অবোধ আবুলতা, লোকের কাছে পাওয়া অসহানুভূতি তাকে অন্যমনস্ক অমনোযোগী করে তুলেছিল। তাই একদিন যেদিন সে অসুস্থ হল, তখন নিজের জন্য কারুকে বিরক্ত না করে সে চুপি চুপি মায়ের কাছে থাকতে গ্রামে রওয়ানা হল।

'রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুৎ নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারো কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।' — সারাদিনের পরে যখন বৃষ্টিভেজা ফটিককে কাদা মাখা অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে আনল, তীব্র জ্বরে সে তখন কাঁপছে। 'ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মা'র কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ধরে এনেছে।' — বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশম্ভর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মিলীত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি ?' — ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিস্ নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।'

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে না। কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, ফটিক ! সোনা ! মানিক আমার ! ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, হ্যাঁ। মা আবার ডাকিলেন, ওরে ফটিক, বাপধন রে ! ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

জানো তো রবি ঠাকুর, আমি কেন এই গল্পটই পড়তে পারিনা ? এর বর্ণনাটা যা বড্ড সত্যি, একেবারে বুকের মাঝে গিয়ে ঘা মারে। আমাকেও একবার মা ছাড়া অনেকদিন দূরের ইস্কুলে পড়তে যেতে হয়েছিল তো ? আমি দুষ্টু ছিলাম না, আমার মাও আমাকে শাস্তি দিয়ে দূর করে পাঠান নি। কিন্তু ঐ যে মাকে ছাড়া একলা শিশুর বোবা কান্না — ও আমার বড় চেনা। গুরুজনেরা শাসন করেন, দুষ্টুমি করলে বকা দেন — অবোধ শিশু কেবল মাকে খোঁজে —, একটু মিষ্টি কথা শুনলে ধন্য হয়ে যায়, আকুল হয়ে ছুটির অপেক্ষা করে। আমি আর আমার মতন যারা মা ছাড়া থেকেছে, ও ভাবটি আমরা সবাই জানি। আমি ফটিকের মত দুর্ভাগা ছিলাম না, আমার মা আমাকে নিজের আঁচলের ছায়ায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ দুঃসহ বেদনা আমার কোনোদিনও যায়নি, কারুরই বোধহয় যায় না। রবি ঠাকুর তোমার মা সেই কোন ছেলেবেলায় তোমায় ছেড়ে গিয়েছিলেন, যাঁকে মনে করে করে তুমি বলেছ 'মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে; মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে।' তুমিও কি মা'কে ছেড়ে থাকার বেদনা কখনো ভুলতে পেরেছিলে ? পারো নি বোধহয় — তাই না ? আর তাই তুমি তোমার নানান্ কাজের মাঝেও জগৎ পারাবারের তীরে শিশুদের খেলা দেখতে পেয়েছ, তোমার সকল কাজে, সকল লেখায় মাঝে মাঝে শিশুদের হাসি কান্না, খেয়াল খুশী কল্পনার ছবি এঁকেছ চিরকাল।

দেবীপ্রিয়া রায় — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চ্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

ভিখারিনি আর কাবুলিওয়ালা

তুমি কি আমায় একটু খাবার দিতে পারো ? আমার মা খুব অসুস্থ আমি নিয়ে যাবো।

কাশ্মীরের বরফ জমা উপত্যকায় সেদিন ভয়ানক তুষারপাত আর ঝঞ্ঝা। রহমত ওর ঝোলা থেকে কাজু কিশমিশ আর মেওয়া বের করে কোমলের হাতে তুলে দিল।

তুমি কে খুঁকি ? কি নাম তোমার ?

– আমি কোমল গো। তুমি কে ?

– আমি মিনির বাড়ি থেকে আসছি। ও শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে।

অবাক চোখে তাকিয়ে কোমল, ও জানেনা ভিক্ষা কিভাবে করতে হয়, তবু মিনির কথা জানতে ইচ্ছে করে। ... মিনি আমায় পহচনতে পারে নি ... প্রবল তুষারের ঝাপটা এসে লাগে রহমতের চোখে মুখে।

– জানো রহমত, আমাকেও চিনতে পারে নি আমার সৈনিক। কোঁচড়ে রহমতের দেওয়া কাজু কিশমিশগুলো রাখতে রাখতে বলে কোমল।

– কে চিনতে পারেনি তোমায় ? তোমার চাচা জান ?

– না রহমত আমায় আমার ভালবাসা চিনতে পারেনি।

– তোমার মহব্বত কোথায় খুঁকি ? তুমিও যাবে শ্বশুরবাড়ি ? কোনরকমে উঠে দাঁড়ায় কোমল। রহমত হাত বাড়িয়ে দেয়। দূরে মিনি ফুলের মালায় সেজে অপেক্ষায় তার মহব্বতের। আর অমরসিংহ এক ধু ধু মরুভূমির বুকে কোমল নামের মরুদ্যানের সন্ধানে।

রহমতের কাশ্মীর আর অমরসিংহর কাবুল মিনি আর কোমলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আজও ।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

সঞ্জয় চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তাহার লোভ জটিল বন্ধ ..."

গীতবিতানের পূজা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে যখন এই কথা বলতে শুনি তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী দীর্ণ জীর্ণ। আজ একশ বছর পরেও সভ্যতার ওপর সংকটাচ্ছন্ন মেঘ ঘনিয়ে আসছে বার বার। তাই সেই অমোঘ তামসিক রাত্রে রবীন্দ্রনাথই পাশে জেগে থাকেন, তাঁর গানে, কবিতায় ও তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁকে স্মরণ করি, আজও, নিজস্বতায়;

দিনান্ত ক্ষণ, নিভছে আলো শেষে,
বটের ছায়া দীর্ঘতর হয়,
ঠাঁই দিয়েছ, আবার পড়াও এসে
মানবতার বর্ণপরিচয়।

কিরণমালী, আঙ্গুল ছুঁয়ে যেয়ো
মিহিরবরণ কাব্যের তর্জমায়,
মূর্ছনাসুর আবার ঢেলে দিও
পূব রাঙানো প্রথম অর্ঘমায়।

তুমিই হতে শিখিয়েছিলে ঋজু,
জড়িয়ে আছো শিরায় উপশিরায়,
তোমায় ঘিরে শান্ত সম কিছু
মুহূর্তরা অতীত দিনে ফেরায়।

শুদ্ধ করো, নবীন আলোক কণায়
মনের শতেক আঁধার যেন কাটে,
তমিশ্রাঘন সংকট সভ্যতায়
ফেরাও জীবন প্রথম সহজপাঠে।

তোমার অবলম্বনে আজ বাঁচি,
তোমায় দেখি আরুনি উদ্দালকে,
সময় ফেরে মাটির কাছাকাছি
স্থবিরতার প্রাচীনতম শোকে।

তোমার ছায়ায় ক্লান্ত এ মন মানাই,
বাঁচতে পারার অবাধ্য জোর আসে,
তুমি আমার হাজার লোহিতকণায়
ছড়িয়ে থেকো নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে॥

রবীন্দ্রনাথ তো আপামর বাঙালির নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জড়িয়ে ... আমারও ... চিরদিনই।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক। ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ। সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

বাঙালির ঠাকুর পুজো

বাঙালি রবি ঠাকুরকে যতখানি পুজো করেছে, রবীন্দ্রনাথকে ততখানি অভ্যাস করেনি। সত্যি বলতে, ভদ্রলোক কি এবং কেন, তাঁর ব্যাপ্তিই বা কতদূর, এ বিচার আম বাঙালি খুব কমই করেছে।

রবি ঠাকুর তো ঠাকুর, দাড়িওয়ালা বেশ সাধু সাধু মার্কা একটা লোক, দেখলেই ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়, কত বই-টই লিখেছে, দেখিস নি আমাদের সিলেবাসে ওনার গল্প আর পদ্য থাকেই থাকে, তার ওপর আবার কেমন সুন্দর শান্তিনিকেতন বলে উইক এন্ড কাটানোর একটা জায়গা করে দিয়েছেন – নাঃ, লোকটাকে মানতেই হচ্ছে।

এই যদি একটা দিক হয়, তবে আরেক দিকে আছে, পড়ি না পড়ি, রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা সেট বাড়িতে মাস্ট, পঁচিশে বৈশাখ এলো কি এলোনা, বাড়ির ছাদে কি বড় ঘরটায় চাড্ডি লোক জুটিয়ে গলা ভারী করে তিনটে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আড়াইখানা পদ্য আর পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে বলে একখানা নাচ। ও হ্যাঁ, সঙ্গে লম্বা লম্বা গোটা দুয়েক লেকচার যেগুলোর সময়ে নিশ্চিতভাবে সামনে বসা বাচ্ছাগুলো ক্যালব্যাল করবে।

এখানেই শেষ নয়। বড়, ছোট, মেজো, সেজো, লিটিল, বিগ, অনলাইন, প্রিন্টেড গুষ্টির যত ম্যাগাজিন আছে, সবার একটা করে রবীন্দ্র সংখ্যা এই সময়ে বেরোবেই বেরোবে জাত বোঝাতে ও বাঁচাতে। তাতে পেন ভাঙা যতসব গুরুগম্ভীর লেখা, সঙ্গে ফাঁকে ফোকরে আরও গম্ভীর সব কোটেশন যেগুলোর বেশীরভাগই লেখার প্রয়োজনে খুঁজে বের করা। অথচ সব লেখাগুলোর সব কথাই আগে কয়েকশো বার লেখা আর ছাপা হয়ে গেছে, শুধু উপলব্ধি করা হয়নি এই যা।

এখন আবার পাড়ায় পাড়ায় গুগাবাবা-র সেই বিখ্যাত সংলাপ রাজকন্যা কি কম পড়িয়াছে-র মতো গান-কবিতা কি কম পড়িয়াছে কেস চলছে। শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রোগ্রাম নামানোর বহুত হ্যাপা। আবার একদিন তাহলে নজরুলকে নিয়ে পড়তে হয়। আর নজরুল লোকটা আরও বিলুপ্তপ্রায় একটা প্রাণী। সর্বসাকুল্যে তার হাতে গোনা ক'টা গান আর পদ্য জানে বেশীর ভাগ বাঙালি। তাই রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা নামিয়ে দাও, তাতে এইট্টি পার্সেন্ট রবি ঠাকুর, বাকিটা নজরুল। ব্যস, তিন ঘন্টার অনুষ্ঠান জমে ক্ষীর।

তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে কারও হৃদয়ের গভীরতম বিষণ্ণতায় আচমকা হাত রাখেন তিনি, অন্ধকারে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে কারও চলবার পথে তাঁর ছোঁয়াতেই কিংবা নিবিড় ভীড়ে হঠাৎই এক কলিতে কাউকে একলা সম্রাটে পরিণত করেন নিমেষে। সত্যি সত্যিই চেতনার রঙে ঝলমল করে ওঠে কখনও কোনো যাপন। বাঙালির জীবনে ও'টুকুই সত্যিকারের, ও'টুকুই পরম স্পর্শ, ও'টুকুই প্রকৃত রবীন্দ্রনাথময়, বাকি যা তা রবি ঠাকুরের পুজোর নামে মস্ত হুড়োহুড়ি, তিনি নিজে যা থেকে চিরকাল ছিলেন সহস্র যোজন দূরে।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

তপনজ্যোতি মিত্র

বিভাসপূরবীর কবিতা

কোন সে উদাসীনতা তোমাকে ছুঁয়ে থাকে এই বসন্তবেলায় ?

তুমি সে কোন গান বাঁধলে কবি ?
তোমার অরণ্য ভরে যাচ্ছে হাজারো পাতায় নিঃশব্দে,
কোন এক নদীর কাছে তুমি দাঁড়িয়ে রইলে
তোমার অরুণ পৃথিবী কি মগ্ন হয়ে থাকলো ভালোবাসায় ?

বিস্ময় কি স্তব্ধ হয়ে থাকে এই গোধূলিবেলায় ?
আলোআঁধারীর রাতে বয়ে যায় অনন্ত হাওয়া,
কোথায় রইলো পুরোনো বাড়ির বদ্ধ জানালা-দরোজা ?

শীতের পৃথিবী থেকে বসন্তে ভেসে আসে গান
তুমি খুলে দাও সব বদ্ধ দরোজাগুলি
খুলে যায় সব জানালা
বিভাসপূরবী এক অমলিন জ্যোৎস্নায় বেজে যায়

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

রবিরশ্মি

আজও গীতার পরে গীতাঞ্জলি
আস্থা আনে বিশ্ব প্রাণে,
দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে
আনন্দময় পাখির গানে।

আমাদের নিঃস্ব দু-হাত শূণ্যে পাতা
তোমার কাছেই ফিরে আসা,
প্রাণের ঠাকুর তুমিই জোগাও
ধ্বংস শেষে বাঁচার আশা।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

বিদিতা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী অধুনা উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি নিবাসী। বাচিক শিল্পী, আবৃত্তিকার ও সঞ্চালিকা। যাপন কবিতা ও কলম। দীর্ঘ ১৪ বছর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি অনুরাগ সাহিত্য। কলকাতা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পর এই প্রথম বাতায়নের সাথে সংযুক্ত হওয়া।

অমৃতা মুখার্জী

শিক্ষক

"ডোন্ট ফাম্বল, যাস্ট আনসার দী কোয়েশ্চেন" প্রায় গর্জন করে উঠলেন প্রোফেসর ঘোষ। টেবিলের উপর কয়েকটা কাগজ নড়ে উঠল, এক্সটার্নাল ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। এম এস সি ফার্স্ট ইয়ারের একজন ছাত্রীকে এইভাবে ভাইভার/মৌখিক পরীক্ষার নামে দাবড়ানো যায় ? ব্যাপারটা অভূতপূর্ব ঠেকল তার কাছেও। কলকাতা ইউনিভার্সিটি হলে এতক্ষণ অধ্যক্ষ ঘেরাও হয়ে দু একটা বোমা টোমা পড়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে গড়ে গেছিলেন এই মহা আশ্রম বিদ্যালয়। নাগরিক কোলাহল থেকে দূরে, প্রকৃতির কোলে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধবিহার মনে পড়ায় এর স্থাপত্য আর পরিবেশ। বিজ্ঞান শাখাটির নাম শিক্ষাভবন। তার প্রাণিবিদ্যার অর্থাৎ যুলজির আজ ফাইনাল ভাইভা চলছে। গুরুদেব ক্লাসরুম ভিত্তিক অন্তঃসার শূণ্য বিদ্যায় বিশ্বাস করতেন না। আর পাশ্চাত্য অনুকরণেরও বিরোধী ছিলেন। প্রফেসার ঘোষের মোচড়ানো ব্রিটিশ আক্সেন্ট শুনলে অবশ্য বোঝা যায়, সেই সব আদর্শে লালবাতি জ্বলে গেছে বহুদিন। যেখানে নব্বই শতাংশ ছাত্র ছাত্রী বাঙ্গালী, সেখানে এরকম বিকৃত ইংলিশ বলে কার কি উপকার হয় কে জানে ?

যেটা হয় সেটা হল এক মুহূর্তের জন্য ও কেউ বিস্মৃত হতে পারে না যে প্রফেসার ঘোষ প্রায়ই সেমিনার দিতে লন্ডনে ও জার্মানি তে যান। এই দুর্ধর্ষ গরমেও তিনি কোট না পরে ডিপার্টমেন্টে আসেন না। পিওন থেকে ছাত্র সব্বাইকে তটস্থ করে রাখেন তার মেজাজ আর সাহেবিয়ানায়। ইমনদের ক্লাস অর্ধেক দিন হয় না। যেদিন হয় সেদিনও পাক্কা কুড়ি থেকে চল্লিশ মিনিট দেরিতে শুরু হয়। স্যারদের তেল দিতে এক্সপার্ট বাঙ্গালী ছাত্রদের এতে বিকার না হলেও মাড়োয়াড়ি ছাত্র আশিস জৈন একদিন বিদ্রোহ করে বসল। সে গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে ভাড়া বাড়িতে থেকে কলেজ করে। সে ছাড়বে কেন ? প্রোফেসর ঘোষ দেরি করে ঢোকা মাত্র সে উঠে দাঁড়িয়ে বই এর ব্যাগ নিয়ে চলে যাবার উপক্রম করে। তিনি হুংকার করায় সে শান্ত মুখে বলে "ইয়ু আর লেট"। আশিসের পিছু পিছু অনেকেই বেরিয়ে আসে সেদিন। ইমন তাদের মধ্যে একজন। আশিস কে নিয়ে নানা মজার গল্প চালু আছে। সে মাড়োয়াড়ি বলে এই একপাল বাঙ্গালির মধ্যে তার কোন হীণমন্যতা নেই। সে বলেই দিয়েছে সে হোস্টেলে থাকবে না। সে সীমান্তপল্লীতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। সেখান থেকে কলেজ যায়। তার ঘরটা দেখে যে কোন লোকের প্রোফেসার শংকুর ল্যাবরেটরি মনে পড়ে যাবে। মাইক্রোস্কোপ, দেওয়ালে আটকানো বিশাল প্রজাপতি, মাকড়শা, ড্রাগন ফ্লাই, বিটকেল গন্ধ ওয়ালা টেস্টটিউব, সর্বোপরি জলের ট্যাংকে একটি মাঝারি সাইজের পাইথন। সাপটার রং হলুদ আর নাম বাহাদুর। সেটা গলায় ঝুলিয়ে আশিস আরামে রাত্রে বেলা পড়তে বসে ছাদে। পাড়ার লোক এমনকি বাড়ি ওয়ালা পর্যন্ত তাকে ঘাঁটায় না। বেরিয়ে আসার পর সবাই আশিসকে চেপে ধরল। এবার কি হবে ? প্রফেসর ঘোষ তো বারোটা বাজিয়ে দেবে ! সামনে ফাইনাল। এমন বাঁশ প্রশ্ন করবে যে তলকূল পাওয়া যাবে না। আর থিয়োরি যদি বা পেরোয়, ভাইভা তে বসিয়ে দেবে। এমন হ্যারাস করবে যে নাকের জলে, চোখের জলে ফেল হবে সবাই। আশিস হাত নেড়ে বলল "এই তুরা বাংগালীরা না বহুত ডিপ্লোম্যাটিক আছিস, তুদের রাবড়ি ও লাগবে, ডায়ারিয়ার ওষুধ ও লাগবে। আমার অত ডর নেই। হামার সাথে কেউ লাগুক, কম্পলিন করব সেন্ট্রাল অফিসে আর ভি সি র কাছে। তাথেও না সলভ হলে হামার বাহাদুর সাঁপ আছে। ভাইভা দিতে আসব গলায় লিয়ে, তখুন দেখবে কার কোত দম আছে !"

সবাই হাসতে লাগল। রাতুল আর হেতমপুরের রসুল ওর পিঠে কিল মেরে বলল "আরে না ! এই জন্য তোকে এত ভালবাসি। মেড়ো হলে কি হয় ? তোর ধক আছে মাইরি ! তা হয়ে যাক, আর দেরি কেন ? নাগিন ড্যান্সের রিহার্সালটা হয়ে যাক। অমনি পাজী ছেলে গুলো হই হই করে সাপুড়ের বাঁশি নকল করে আশিসের চারিদিকে বাজাতে লাগল। তার সঙ্গে ত্রিদিবের কোমর দুলিয়ে নাচানাচি। ইমন ও হাসছিল। উফ এই ছেলেগুলো এত ফাজিল ! সব ব্যাপারেই ইয়ার্কী। সে তখনি

জানত আর যাকেই হোক, তার নিজের কপালে দুঃখ আছে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রোফেসর ঘোষ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ক্লাসে দাঁড় করিয়ে কঠিন প্রশ্ন করেন। না পারলে তো খারাপ কথা বলেনই পারলে যেন আরো রেগে যান। ইমন আন্দাজ করে এর কারণ। ইমনের এক দূর সম্পর্কের দাদা এই ডিপার্টমেন্ট-এ পড়ত। সে নকশাল আন্দোলন করত, এবং জনশ্রুতি যে প্রোফেসর ঘোষের স্ত্রীর সাথে তার একটু শেষের কবিতা ছিল । জীবন তার পর ষোল বছর পেরিয়ে গেলেও তার আক্রোশটা আস্তিনের তলায় লুকনো ছুরির মত ইমন টের পায়। অবশ্য পুরোটাই তার অনুমান। সঠিক কোন প্রমাণ নেই ।তবে এটা সত্যি যে প্রফেসরের ল্যাবে চান্স পেতে গেলে রিসার্চ যেমনই হোক না কেন মার কাটারি সুন্দরী না হলে আশা কম। এবং কেউ কেউ অতিষ্ঠ হয়ে ছেড়ে গেছে এমন গুজব ও ফুলের রেণুর মত বাতাসে ওড়ে। ইমন কোনদিন আপ্লাই করেনি। সে সমস্যা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। প্রফেসর ঘোষ আবার দাবড়ালেন। "আর ইউ ডেফ ? কান্ট ইউ হিয়ার ? হোয়াট ইস দি ডিফারেন্স বিটুইন কুশিং ডিসীস আন্ড কুশিং সিন্ড্রোম ?" এক্সটার্নাল ভদ্রলোক হেসে বললেন "এটা কিন্তু এম এস সি ফার্স্ট ইয়ারের পক্ষে শক্ত প্রশ্ন ! বাট, ওকে একটু সময় দিন।"

ইমন সোজা উনার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল "কুসিং ডিসীজ হল যখন শরীরে করটিকো স্টেরয়েড হরমোনটা বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে একটা গ্রোথ, বা টীউমার যেটা এটাকে ইন্সটিগেট করছে।"

প্রফেসর ঘোষ টেবিলের উপর ঘুষি মেরে বললেন "সেটা তো কুশিং সিন্দ্রোমেও হয়। হরমোন বেড়ে যায়। আলাদাটা কি ?"

ইমন আবার তাকাল। তার চোখে সাইবেরিয়ার বরফ। "আলাদা এই, যে কারণটা টিউমার নয়। অন্য কিছু হতে পারে।"

এক্সটার্নাল খুব খুশি হয়ে বললন "একদম ঠিক ! বাহ ফুল মার্ক্স"। প্রোফেসর ঘোষ তেরিয়া হয়ে উঠলেন "ডু নট ট্রাই টু ওভার সিম্পলিফাই। অন্য কি হতে পারে ? বলতেই হবে। এটার সাইটোলজিটা কি ? আর অন্য হরমোন গুলোর ইন্টারাকশন কি এর সাথে ? বল বল ?"

ইমন চুপ করে থাকল। এই অভদ্রতা, পাগলামির কি সত্যি কোন উত্তর হয় ?

এক্সটার্নাল ভদ্রলোক বললেন, "আমি বরং একটা প্রশ্ন করি। বলত ? থাইরয়েড হলে হর্মোনটা বাড়বে না কমবে ?"

"দু রকম হতে পারে স্যার ! হাইপো আর হাইপার। তবে হরমোনটা উল্টো। টি এস এইচ। বাড়লে হাইপো, কমলে হাইপার।"

"চমৎকার। তাহলে বল গয়টার টা কিভাবে হয় ? মানে বাংলায় যাকে বলে গলগন্ড।"

"এটা খুব ডিটেলে জানি না স্যার ! পুরোটা পড়িনি।"

প্রফেসর ঘোষ ঝাঁপিয়ে পড়লেন "আন্ড হোয়াই ইস দ্যাট ? কেন পড়নি ?"

ইমন মাথা নীচু করল "এ ক্লাস টা হয় নি স্যার, আপনি ছিলেন না, জার্মানি গেছিলেন।"

"ওয়ান্ডারফুল, নিজেরা পড়বেনা, ক্লাস বয়কট করবে, আর বাইরের লোকের সামনে প্রফেসর কে অপদস্থ করবে। ডিসগ্রেস ফুল। এ বাঞ্চ অফ লুসারস। যাও পলিটিক্স কর, আর কি করবে ? হাতে বোমা নিয়ে লোক মারো। তোমার দাদা যেমন করতেন। লেখাপড়ার মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমাদের মাথা ব্যথা হবে কেন ? হবে তো সেই কেরানী ! জার্মানি যাবার মর্ম বোঝো ? যাবার যোগ্যতা হবে কোন দিন ?"

ইমন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ঠান্ডা গলায় বলল "না হবেনা স্যার। তবে যদি কোন দিন হয়, ছাত্রদের সিলেবাস পুরো শেষ করে তারপর যাব।"

সে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। প্রফেসর ঘোষ দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন "তোমাকে আমি দেখে নেব, এই ভাবে চলে যাওয়ার জন্য তোমাকে পুরো কোর্সে ফেল করানো হবে।"

ইমন দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল "আমি জানি আপনি তা পারেন স্যার ! আপনার অনেক ক্ষমতা। তবে আমি রাজনীতি করিনা, বোম ও মারতে জানিনা, তাই,আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

বাইরে ভাদ্রের দুপুর ধু ধু করছিল। লজ্জায়, অপমানে তার মাথা দপদপ করতে লাগল। ক্যান্টিনে এসে এক বোতল ঠান্ডা জল সে হড়হড় করে মাথায় ঢালল। তারপর সাইকেল টা নিয়ে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘুরতে লাগল। আম্রকুঞ্জের কাছে সে যখন এসে পৌঁছল তখন বেলা পড়ে এসেছে। ঘন সবুজ পাতায় পাখ পাখালি রা কিচমিচ করছে, সুর্য নামছে পাটে। উপাসনা বেদীর পিছনের শাল গাছে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। চোখ দিয়ে আগুনের লাভা জল হয়ে পড়ছিল। সে চলে যাবে। আর এখানে পড়বে না। তাদের পাড়ার গর্ভমেন্ট কলেজে ট্রান্সফার নেবে। সারাদিনের ক্লান্তি আর অনাহারের ধকল তাকে পরাস্ত করে ফেলল। কখন তার চোখ বুজে এল। স্বপ্নের মধ্যে সে হেঁটে যাচ্ছিল উনার পিছু পিছু। শালবনের মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে তার কালো জোব্বা। সিল্কের মত রূপালি চুল উড়ছে মৃদু বাতাসে। বাঁশির মত সুরেলা গম্ভীর গলা। "জান ! ছোটবউ এর সব গয়না বিক্রি করে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম। মেয়েরাও যাতে পড়তে পারে। আমার নিজের দেশের লোক আমাকে বোঝেনি, বলেছিল বেশ্যার দালাল। আমি কারো কোন ক্ষতি করিনি, কিন্তু সারা জীবন লোকে আমাকে কুৎসিত সমালোচনা করেছে, আঘাত দিয়েছে, ঠকিয়েছে ! আমি মনে করি সেই আমার পুরস্কার। আমি আমার কাজ করে গেছি। বিধাতাকে বলেছি বজ্রে তোল আগুন করে আমার যত কালো। নিঠুর হে ! এই করেছ ভালো।"

থামলেন নীলমণি লতার গাছ টার তলায়। রাশি রাশি নীল ফুল, মিশে গেছে আকাশের নীলে। উদাস তিনি। উর্ধ্বনেত্র, বাহ্যজগৎ লুপ্ত। কে যেন দূর থেকে ডাকছে 'ইমন' ! 'ইমন' !

সে ধড়মড় করে উঠে বসল। বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। "কি ইডিয়ট রে তুই ? ইখানে ঘোস্টের মত বুসে থাকলি কেনু ?" আশিস গজ গজ করে উঠল। "হামরা তুকে অনেক খুজলাম, আমরা এক্সাম বয়কট করে দিল। কেউ দিব না। স্যার তুকে ইনসাল্ট করল। আমরা মানব না। ভি সি আমাদের কথা শুনল। রি টেক হবে।" মানু, কাজল সবাই ইমন কে জড়িয়ে ধরল। আশিস বলল "চল, এখুন বাহাদুরের ভুখ লাগল। চুহা ধরতে হবে।"

সবাই হো হো করে আশিসের মাথায় চাঁটি মারল। রাতুল বলল "নেক্সট ইয়ারে রক্তকরবী তে তোকেই রঞ্জন করা হবে রে বাহাদুরের বাপ মেড়ো, তবে তার আগে তোকে বাঙ্গালী করতে হবে।"

আশিষ বিরক্ত হয়ে বলল "আমি তো বাংগালীই হচ্ছি।"

অমৃতা মুখার্জী সাহিত্যের জগতে পা দিয়েছেন মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই প্রকাশিত ১১টি বই। ইংরাজী ও বাংলায় সমান দক্ষতায় লিখে চলেছেন। প্রথম উপন্যাস হাউস ওয়াইফ চলচিত্রায়ণের পথে, অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। জনপ্রিয় বই গুলির মধ্যে আছে এক আকাশ কবিতা, কাদম্বিনীস আজকাল। ফাইন্যান্স প্রমিস সর্বোচ্চ বিক্রিত আমাজনে। পেশায় চিকিৎসক। থাকেন আমেরিকার ফ্লোরিডায়। নিজের কবিতা নিজে আবৃত্তি করেছেন মিউসিক ভিডিওতে।
যোগাযোগ : ritadoc2012@yahoo.com

শাশ্বতী বসু

সঞ্জীবনী

ও -- লিও লিও -- লা

এলা লেগা ক্রেসেরা

এনো আত্রি লাভোরা তোরি

এনো আত্রিলা ভো ও ও রা তো ও ও রি

সমবেত স্বরে গানের মুখরা নিনাদিত হচ্ছে – উঠছে উচ্চ থেকে উচ্চ গ্রামে – উত্তেজনায় গানের তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্চে । সঙ্গে বাজছে তাম্বুরিন – যেটা বাঁধা এলিজাবেথের গলায় ।

ফেডারেশন স্কোয়ার । তার উন্মুক্ত মঞ্চে কয়েকটি তরুণী গান গেয়ে চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গত হচ্ছে শরীরী ভাষায় আর হাতের সমবেত তালিতে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। এ গানের আছে এক অদ্ভুত সন্মোহন আর মাদকতা। তারই টানে দর্শকের ভিড় জমছে চাতালে – একজন দুজন করে। অনেকে শুধু দাঁড়িয়েই দেখছে না – গলাও মেলাচ্ছে মুখরাতে এসে – ও -- লিও লিও -- লা -- এলা লেগা – ----।

আজ ৮ই মার্চ । বিশ্ব নারী মুক্তি দিবস। তারই উদযাপনে এই তরুণী দলের গান গাওয়া চলছে ফেডারেশন স্কয়ারের এই উন্মুক্ত মঞ্চে ।

রচনা আজ বাজার করতে বেরিয়েছিল। বাজার শুরু করার আগেই কানে এসেছিল এই উদ্দাম সঙ্গীত। সেই গানের টানে কখন যেন সেও এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। ওর চোখ টানছে তাম্বুরিন বাজানো মেয়েটি। গানের উত্তেজনায় টকটকে হয়ে রয়েছে তার মুখ ও কর্ণমূল। হয় তো বাজানর পরিশ্রমও যোগ হয়েছে তাতে। চোখ দুটো টানা টানা স্বপ্নিল – কপালে কালো সাটিনের রিবন ঘুরিয়ে মাথার পেছনে টাইট করে বাঁধা – কানে ঝোলানো দুল ঝিকিয়ে উঠছে শরীরের বিভঙ্গে ।

ও -- লিও লিও -- লা – কখন যে রচনাও গান গাইতে শুরু করেছে এই সঙ্গীতময় ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা সে নিজেও খেয়াল করেনি। গান শেষ হয়ে যায় একসময়ে। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে সরে গেলেও রচনা কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে তখনো সেখানে। একটা ছোটখাটো জটলা এখনো সেই তরুনীদের ঘিরে।

– ব্যান্ড এইড ? কারো কাছে ব্যান্ড এইড পাওয়া যাবে ? উচ্চকিত স্বর শোনা যায় সেই জটলার মধ্যে থেকে। রচনা দ্রুত পায়ে এগোয় সেই জটলা লক্ষ্য করে। ওর হাতে ততক্ষণে উঠে এসেছে একখানা ব্যান্ড এইড – তার অল-ইন-ওয়ান হ্যান্ড ব্যাগ এর ভেতর থেকে। রচনা ব্যান্ড এইড টা উঁচু করে তুলে ঢুকে যায় একদম জটলার মাঝখানটিতে । দেখে সেই তাম্বুরিন বাজানো মেয়েটির আঙ্গুল থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। একটা টিস্যু পেপার দিয়ে রক্ত পড়া আটকানো হচ্ছে। রচনাকে দেখা মাত্র একটি লম্বা মত মেয়ে হাত বাড়িয়ে দ্রুত ব্যান্ড এইড টি তুলে নেয় তার হাত থেকে।

– থ্যাংক ইউ প্লিজ। আরও থাকলে একটু বের করে ফেল তাড়াতাড়ি। বলে অসম্ভব তৎপরতায় কিন্তু খুব সন্তর্পণে মেয়েটির আঙ্গুলে ব্যান্ড এইড টি জড়াতে থাকে সে। আঙ্গুলের অধিকারিণী তখন রচনার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে মৃদু হাসে। ব্যান্ড এইড এর ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরেই চারিদিকের ভিড় পাতলা হতে শুরু করে। থেকে যায় শুধু রচনা আর গানের দলের তরুণীরা ।

আলাপের সেই শুরু গানের দলের মেয়েদের সাথে রচনার। বিশেষ করে এলিজাবেথের সঙ্গে। সেদিন তারা অনেকক্ষণ বসেছিল ফেডারেশন স্কোয়ারের চত্বরে। রচনা শুনেছিলো ওই অশ্রুতপূর্ব ইতালীয় লোকগানটির ইতিহাস। সেই লম্বা মত মেয়েটি – যার নাম জেনেছিল রেচেল – সেই এই গানটির ইতিহাস বলতে শুরু করে। রচনারই ঔৎসুক্যে। ততক্ষণে ব্যান্ড এইড এর খাতিরে রচনার সঙ্গ তরুণী দলের মধ্যে সাদরে গৃহীত হয়েছে। জানা যায় এই গানটি আজকাল মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোহের গান হিসেবেই ব্যাবহার হয় ইতালিতে। গানটি লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের কোন একটা সময়।

– আর জানো গানটি লিখেছিল একটি মহিলা। রেচেলের গলার উত্তেজনা রচনার নজর এড়ায় না।

– কিন্তু কেন এই গান টি লিখেছিল সে ? কারণ কি ?

রচনা জিজ্ঞেস করে। কারণ গানটির ভাষা ইতালিয়ান বলে এর মাথামুণ্ড কিছুই বোধগম্য হয়নি তার।

– ইতালির এক প্রত্যন্ত গ্রামে ধান উৎপাদক নারী শ্রমিকরা তাদের মালিকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। কারণ তাদের সাথে করা চুক্তির কোন শর্তই মালিক মানত না। বঞ্চিত মেয়েরা এই গান গেয়ে আন্দোলন চালাত পথে। এই গান তাদের বিদ্রোহের অন্যতম হাতিয়ার ছিল, ছিল বিদ্রোহের সিম্বল বা প্রতীক। তারা ইউনিয়ন গড়ে ছিল। উনিশ শতকের সেই সময়ে পৃথিবীর কোন জায়গাতেই খুব বেশী ইউনিয়ন সংস্কৃতি শুরু হয়নি। রেচেল বলে।

রচনা এই ইতিহাস শুনে খুবই উত্তেজিত বোধ করতে শুরু করেছিল। ওর ততক্ষণে মনে পড়ে গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য সলিল চৌধুরীর লেখা সেই বিখ্যাত গান –

হেই সামালো ধান হো, কাস্তে কাটাও শাণ হো,
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

কি আশ্চর্য ! সলিল চৌধুরী কি কোন জায়গায় ইতালির এই গানটির সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছিলেন ! কে জানে ? রচনার অন্তত সেটা জানা নেই। যদিও এটা ঠিক যে দুটো গানের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তবে দুটো গানে একই ধরনের পটভূমি একই ধরনের উন্মাদনা আছে। রচনা তখনকার মত এই সব তথ্য সরিয়ে রেখে মেয়েদের বলেছিল –

– আরে জানো আমাদের দেশেও কৃষক বিদ্রোহের একটা গান আছে। সেটা আমাদের রাজ্যে কৃষক দের "তে ভাগা" বলে এক কৃষক আন্দোলনের সময় লেখা হয়েছিল। এটাও এই ইতালিয়ান গানটির মত মালিকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহের গান। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই গানটি কোন বিদ্রোহী কৃষকের কলম থেকে বের হয় নি। লিখেছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির এক সদস্য।

– ইস ইট ? দেন ইউ স্যুদ তিচ আস দি সং। প্লিজ জয়েন আওয়ার গ্রুপ র্যা চানা। রেচেল আর ফরাসিনি এলিজাবেথ সমস্বরে বলে উঠে ছিল সেদিন। ওদের কথায় সত্যিই পরে রচনা যোগ দিয়েছিল সেই গানের গ্রুপে। তারপরেই শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য এক অধ্যায় রচনার জীবনে।

লোক্যাল গভমেনটের একটা সাংস্কৃতিক শাখায় রেচেলদের দলটি গান বাজনা করে। সেখানেই রচনা একদিন চলে গিয়েছিল। মনে আছে কোন এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় রচনা এসে পৌঁছেছিল রেচেলদের জমায়েতে। ততক্ষণে অনেকেই এসে গেছে। দু-একটি চেনা মুখ। ছোট খাটো হালকা ব্যায়াম চলছে। গান গাইবার আগের প্রস্তুতি। রচনা একপাশে দাঁড়ায়

গিয়ে। রেচেল হাতের ইশারায় ঘরের কোনে স্তুপ করে রাখা চেয়ার গুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়। রচনা গিয়ে একটা চেয়ার টানতেই হুড়মুড় করে আরও চার পাঁচটা পড়ে যায়। বাকিরা তখন দুড়দাড় করে এগিয়ে আসে। তারপরে হাতে হাতে দ্রুত গতিতে সব চেয়ার পাতা হয়ে যায় কারপেট মোড়া মেঝেতে। এই চেয়ার পাততে পাততেই হাসি ঠাট্টায় রচনার সঙ্গে আরও অচেনাদের পরিচয় হয়ে যায়। রচনা বসেছে ততক্ষণে। তার চোখ তখন এলিজাবেথ কে খুঁজছে। এলিজাবেথ এলো অবশেষে। অনেক দেরী করে। তবে মুখে হাসি, কালো রিবন আর স্বপ্নিল চোখ নিয়ে সে যখন ঢুকল তখন মনে হোল যেন দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠের একরাশ টাটকা হাওয়া নিয়ে এসে সে ঘরে ঢুকল। এলিজাবেথ সত্যিই সুন্দর।

কেন সে এতো দেরীতে এলো – সবার এ প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল। নয় নয় করেও বেশ কয়েকশো ভেড়া আছে তাদের। তাদের অনেকেরই এখন সংসার বেড়েছে। সেই বৃহৎ সংসারের নতুন সদস্যদের দেখাশুনোর ভার এলিজাবেথের ওপর। সেই সব করতে গিয়েই তার দেরী হোয়ে গেছে। বোঝা গেল এলিজাবেথের স্বামী সম্পন্ন কৃষক।

– এই দেখো না হাত কি রকম লাল হয়ে গেছে! বলে সে তার করতল প্রসারিত করে হাসে। রচনার ভারী ভাল লাগে তার এই ছেলেমানুষি হাসিটি। রচনা এতক্ষণে আবিস্কার করে কেন এলিজাবেথ কে এতো আকর্ষণীয় মনে হয় তার। তার কারণ বোধ হয় এলিজাবেথের এই খোলামেলা ও অকপট ব্যবহার ও নিষ্পাপ হাসি। কোন ভণিতা নেই তার ব্যবহারে। তাই এলিজাবেথের উপস্থিতি এতো সজীব আর টাটকা। রচনা ততক্ষণে এলিজাবেথ কে তার পাশের চেয়ারটি এগিয়ে দিয়েছে।

তারপরে জোর কদমে চলল রচনার গান শেখানোর পালা। 'হেই সামালো' সবাই উঠে পড়ে শিখতে লেগেছে। অডিও ক্যাসেটে সবাই কে গান দেওয়া, স্বরলিপি বানানো পাশ্চাত্য গায়িকা কে দিয়ে এবং কয়েক মাসের চেষ্টার শেষে একদিন হল ভর্তি দর্শকের সামনে সেই গান গাইল রচনা ও বিভিন্ন দেশের মেয়েরা। গান শেষ করে মঞ্চ থেকে দর্শক আসনের দিকে আসতেই এক বাঙালি ভদ্রলোক বললেন 'কি করে এই অসাধ্য সাধন করলেন ? গান শুনে মনেই হচ্ছিল না যে ইউরোপিয়ান রা গাইছে'। রচনা খুশী। ঘাড় ঘোরাতেই – এক্সকিউস মি ! কুদ ইউ হাভ এ ফিউ মিনিতস ? এক মাঝারি উচ্চতার ভারী চেহারার টাক মাথা মধ্য চল্লিশের পোলিশ ভদ্রলোকের সামনে পড়ে যায় রচনা।

– ওঃ সিওর সিওর – রচনা তাড়াতাড়ি বলে।

ভদ্রলোকের কথায় জানা গেল তিনি স্থানীয় 'কমিউনিটি টি ভি' চ্যানেলের প্রতিনিধি। রচনাদের গান শুনে তার ভাল লেগেছে। তিনি তাদের এই মিউজিক্যাল গ্রুপের উপর একটি আধা ঘণ্টার প্রোগ্রাম করতে চান। অবশ্য রচনাদের আপত্তি না থাকলে।

তারপরের ইতিহাস খুবই সাবলীল গতিতে এগিয়েছে। প্রোগ্রামে কারো আপত্তি তোঁ দূরের কথা, উৎসাহে টগবগ করেছিল সবাই। আজ প্রোগ্রামের শুটিং হয়ে গেছে। রেচেল রচনাদের সাক্ষাৎ কার রেকর্ড করাও হয়ে গেছে। তিনটে গান ফাইনাল রেকর্ডিং হয়ে গেছে এই মিনিট কয়েক আগে। টি ভি চ্যানেলের স্টুডিও তে। সেই তিনটে গানই রেচেল রা সবাই মিলে সিলেক্ট করেছিলো। কিন্তু এই তিনটে গান থেকে একটা গান বেছে নেবে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। কোন গানটি টি ভি চ্যানেল নিয়েছে সেটা জানার জন্য ওরা অপেক্ষা করছে তখন স্টুডিও তে। সে এক অদ্ভুত মনের অবস্থা। তিনেটি গানের মধ্যে রেচেলের একটি পছন্দের গান ছিল। সেটার কম্পোজার আবার স্বয়ং মোজার্ট। দ্বিতীয়টি রচনার 'হেই সামালো' আর একটি এলিজাবেথের ফ্রেঞ্চ গান। কোন টি ? সবার সেই একই প্রশ্ন মনে মনে। অবশেষে সেই পোলিশ ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে – হাই র্যা চানা – কংগ্রাচুলেসন্স ! চ্যানেল সিলেক্টস ইওর সং – দি বেঙ্গলি ওয়ান ! খুব হাত তালির ঝড় বইল। তারপর থ্যাংক ইউ এর পর্ব শেষে রচনারা ফিরে এলো ওদের নিজেদের মিটিং রুমে।

এখন সবাই বসে আছে। খাবার অর্ডার করা আছে। খেয়ে ফিরবে। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। রেচেলের মুখ থম থমে। কারণ রেচেলের গানটি ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটি ধর্ম সংক্রান্ত গান বা প্রার্থনা সঙ্গীত। বিশেষ করে ক্যাথলিক ও অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের চার্চের Mass এ এটি গাওয়া হয়। যেখানে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করা গানটির মূল বক্তব্য। তাই গানটি নির্বাচিত হয়নি বলে রেচেলের মনে হচ্ছে ঈশ্বরের করুণা থেকে যেন ওরা বঞ্চিত হয়েছে। রেচেল ভাবছে এটা হয়ত সবার জন্য একটা ব্যাড 'ওমেন' ও।

রাখো তোঁ এসব মন খারাপের কথা। চল র্যাচানা আমরা সেই গানটা গাই যাতে সবার মন ভাল হয়ে যায়।

রচনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় এলিজাবেথের দিকে

– ওহ দ্যাত soothing one …. তোমার pain killer তুমি বললে ...। তুমি যেটা আমায় শেখালে সেদিন আমাদের লাস্ট মিটিং এ।...। অবশ্য আমি গানটির কি অর্থ কিচ্ছু জানি না ... তুমি প্রমিস করেছো আমায় বলবে পরে ...।।

রচনা চুপ করে ছিল। সঙ্গীদের মনের অবস্থা দেখে ওর আনন্দ উবে গেছে। একটা কষ্ট যেন দলা পাকিয়ে আছে গলার কাছে। এলিজাবেথের কথায় ও ধীরে ধীরে বার করে ওর প্রিয় গানের বইটি ... মূল গানটি আর তার ইংরেজি আনুবাদ যে পাতায় আছে সেখানে একটি মার্কার দেওয়া। সেই পাতাটি খোলে। চোখ যায় তার তার প্রিয়তম গানে। যে গানে সে প্রাণ ফিরে পায়। যে গান তার যে কোন কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে এক লহমায়। যে গান ..... রচনার চোখ ভিজে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রিং ক্রিং ক্রিং দরজার ঘণ্টাটি জানায় ওদের ঈপ্সিত বস্তুটির আগমন সংবাদ ।

এরপর বহুদিন গড়িয়ে গেছে। জীবন তার নিজস্ব নিয়মে চলছে। শুধু এলিজাবেথেরই দেখা নেই প্রায় বছর খানেক। মোবাইলে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে প্রায় মুছেই যাচ্ছে রচনাদের দৈনন্দিন যাপনের পাতা থেকে। হঠাৎ একদিন রোজকার মত সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে রচনা। কদিন একটানা বৃষ্টির পর আকাশ আজ মেঘহীন। হালকা টাটকা সতেজ হাওয়ায় রচনার মনে একটা প্রসন্নতার আমেজ। ঠিক সেই সময়টাতে হঠাৎই এলিজাবেথের মুখোমুখি হয়ে গেল রচনা।

– এ-লি-জা-বে-থ তুমি-ই-ই - ? ক--ত দিন পরে ? কি হয়েছিল কি তোমার ? কেমন আছো ? ততক্ষণে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। এই একরাশ প্রশ্নের উত্তরে এলিজাবেথ শুধু হাসে। এলিজাবেথকে অনেক রোগা লাগছে। বয়স্কও। তবে তার প্রসন্ন হাসিটি ঠিক একই রকম আছে। অমলিন।

– চল, আজ আমার বাড়ীতে। বেশী দূর নয়। পনেরো মিনিট হাঁটা পথ। যেতে যেতে কথা হবে। বলে এলিজাবেথ।

কথা হয়। দুজনের নয়, শুধু এলিজাবেথই বলে যায়। তার বঞ্চনার কাহিনী। এলিজাবেথের স্বামী মার্ক মারা যাবার পরে মার্কের আগের পক্ষের ছেলেরা এলিজাবেথকে মার্কের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। উইল জাল করে। আরও মিথ্যে অপবাদ দেয় যে এলিজাবেথের ছেলে 'আরথার' আসলে মার্ক এর ছেলেই নয়। এরপরে এলিজাবেথ আর ওই বাড়িতে থাকে নি। চলে আসে আরথারকে নিয়ে।

– তুমি কোর্টে যাও নি ? বিস্মিত রচনার স্বর ক্রুদ্ধ শোনায় ।

– না। তাতে আরথার এর মনের উপর এর ফল ভাল হত না। ও বড় হোক। তখন একসাথে – তা ছাড়া যে অপবাদের সব টাই মিথ্যে তার প্রতিবাদ করলে বোধ হয় তাকে খানিকটা গুরুত্ব দেওয়াই হয়ে যায়। থাক – এই তোঁ বেশ আছি। আমার গানের স্কুল নিয়ে, আরথার কে নিয়ে। এই তোঁ এসে গেছি আমরা। এসো ।

রচনার পা যেন চলছে না। একি শুনল সে ? মানুষ কি এতদূর ...?

অন্যমনস্ক হয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে একটা চেনা চেনা সুর অস্পষ্ট ভাবে যেন কানে আসে তার। রচনা এলিজাবেথের দিকে তাকায় –

– প্রার্থনা সঙ্গীত। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই সময়ে গায়। এলিজাবেথ বলে,

ততক্ষণে প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হয়ে যায় রচনার। এলিজাবেথের গানের স্কুলের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে গাইছে –

" জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারা এসো
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়
গীত সুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার ----
হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ শান্ত চরণে এসো।
জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারা এসো ---------"

এলিজাবেথ হাসে। সেদিন তোমার গানের বইটি তুমি ফেলে গেছিলে। আমি তুলে নিয়েছিলাম। এই দেখো।

রচনা দেখে এলিজাবেথের হাতে তার প্রিয় গানের বইটি। পেজ মার্কার সহ।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

স্বর্ভানু সান্যাল

শান্তি নিকেতন

শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বসে সঞ্চয়িতার পাতা ওলটাচ্ছিলেন এক পলিতকেশ বৃদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। অনেক বছর আগে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলে আজও মাঝে মাঝে এসে বসেন তাঁর এই প্রিয় পাঠাগারে। সে অনেক বছর আগের কথা। তখন এই বিদ্যাস্থান সত্যি সত্যি শান্তির পীঠ ছিল। গাছে গাছে কোকিলের কুহু গীতালিতে ঘোষিত হত বসন্তের আগমন বার্তা।গ্রীষ্মের শুরুতে পলাশ শিমুল গাছে কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির লাল রঙে আঁকা হত চোখ জুড়োনো ছবি। বৃদ্ধ পিতামহের মত স্থির অশ্বত্থ গাছের নিশ্চিন্ত আদুরে কোলে বসে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কলার পাঠ নিত দেশ বিদেশের বিদ্যার্থীরা। বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে স্মৃতির খেয়ায় ভেসে সেই সুন্দর দিন গুলিতে পাড়ি দিচ্ছিলেন বৃদ্ধ। ফেব্রুয়ারির মিঠে রোদ্দুরের মত নস্টালজিয়ার আলতো উত্তাপে নিজের বিষণ্ন মনকে দিচ্ছিলেন ক্ষণিকের বিনোদোবসর। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় এসে থেমে গেলেন।

"আজি হতে শত বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ আমার কবিতাখানি ?"

সত্যি কি আজ আর কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে ? বিশ্বায়নের বিদ্ধংসী সুনামিতে নিয়ত ঘরছাড়া হতে থাকা মানুষ, সোশ্যাল মিডিয়ার নেশাতুর আকর্ষণে বহ্নি পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হতে থাকা মানুষ আজও কি সাহিত্য সরোবরে স্নান করতে আসে ? কুবেরের ধনের মত অপরিসীম সিনেমা, সোপ সিরিয়াল আর শর্ট ফিল্মের পরিসরে আর তাদের আগ্রাসী বানিজ্যায়নের যুগে এই যে ছাপার অক্ষরে লেখা, স্থবির, চিন্তার উপাদান তা কি আজ মানুষকে আর ভাবায় ? উপন্যাসের পাতায় পাতায় সযত্নে গড়ে তোলা কায়াহীন চরিত্ররা – তারা কি আজও মানুষের বিনোদনের মাধ্যম হয় ? সেই এক শতক আগের দিনগুলোর মত উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্ররা কি তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয় ? নাকি সাহিত্যের পরিসরে আটকে আছে সেই মানুষগুলো যারা এই দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে নি ? অতীতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাওয়া কিছু রোমান্টিক ভুতকল্প মানুষ – তারাই কি শুধু আজ সাহিত্যের রসাস্বাদন করছে ? এই প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। শুধু এটুকু বুঝতে পারেন যে খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে সব কিছু। তিন গুণ ফাস্ট ফরোয়ার্ডে দেখা ছায়াছবির মত মানব সভ্যতার গল্পগুলো দ্রুত শুরু থেকে শেষের পথে ছুটে চলেছে। সাফল্যের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হওয়া আজকের মানুষ ক্রমাগত ছুটছে। একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার অবসর না নিয়ে শুধুই ছুটছে যতক্ষণ না পর্যন্ত দম ফুরিয়ে যাওয়া পুতুলের মত ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছে। আর এই অনর্গল প্রতিযোগিতা যেন কোন নিষ্ঠুর হাতের চাপে মানুষের শান্তির নীড়টাকে তছনছ করে দিয়েছে। আজকাল কাগজে চোখ রাখলেই মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। নৃশংস হত্যা, শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে তহবিল তছরুপ – এ সমস্ত খবরই প্রথম পাতায় তার শ্রীহীন মুখ নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ে থাকে। তার এই অতি কাছের শান্তিনিকেতনটাও বড় একটা শান্তির নিকেতন নেই – বৃদ্ধ ভাবছিলেন বসে বসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতধারার প্রভাব আর বিশ্বজোড়া নৈতিক অবক্ষয়ের থেকে আড়াল করে রাখা যায় নি এই শান্তির নীড়টিকে। আজকেই দুপুরবেলা বিভিন্ন দফা দাবিতে উপাচার্যকে ঘেরাও করেছিল ছাত্র সংগঠন। দানবীয় হুঙ্কারের মত চলছিল ক্রুদ্ধ স্লোগান। রাজনৈতিক মদতপুষ্ট শিক্ষার্থীদের চোখে তাদের শিক্ষাগুরু, অধ্যাপকদের প্রতি ছিল না ন্যুনতম শ্রদ্ধা। শিক্ষক না ছাত্র কাদের দাবী ন্যায্য সে প্রশ্ন তর্কসাপেক্ষ কিন্তু এই সাহিত্য শিল্প কলার পীঠস্থানে যে অশান্তির বীজ বপন করা হয়েছে তা একদিন বিরাট বিষবৃক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে ভাবলেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের বুক দুরু দুরু করে। মনটা ভারি বিষাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এর থেকে কি কোন অব্যাহতি নেই ? এই উন্মত্ত উত্তপ্ত পৃথিবী কোন শান্তিবারি বর্ষণে শীতল হবে জানা নেই তাঁর।

বইয়ের পাতাটা খোলা অবস্থায় ছেড়ে তিনি গোধূলির আধো অন্ধকারে দীর্ঘ করিডোর দিয়ে হেঁটে চললেন অপর প্রান্তে। সীমন্তিনীর লাল টিপের মত লাজুক সূর্য তখন দিগন্তে লাল আবির ছড়াচ্ছে। মেঘেদের কুয়াশা ভেজা শরীর সেই আবির মেখে একটা অদ্ভুত রক্তিমাভা বিচ্ছুরণ করছে যা কোন এক অপূর্ব মায়ালোকের আবহ রচনা করে। একটা ছাতিম গাছের ডালে বসে একটা ডাহুক ব্যস্ত স্বরে কাকে যেন ডাকছে। ছাতিম ফুলে তীব্র মোহময় গন্ধে ভারি হয়ে আছে গোধূলি বাতাস।

হাঁটতে হাঁটতে বৃদ্ধ পৌঁছলেন করিডোরের অপর প্রান্তে। প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথের বাসভবন উত্তরায়ণে। এখন সেটা সেই অমর কবির বিভিন্ন ব্যাবহার্য সামগ্রীর সংরক্ষণাগার। সেই গানওলা যা একটা জাতির রক্তে মিশে শিরায় উপশিরায় ধমনিতে ধমনিতে ছড়িয়ে পড়ে তার অন্তরাত্মার সাথে একাত্ম হয়েছে একটা পুরো শতক জুড়ে। একটা জাতির সুখে দুঃখে ভালবাসায় প্রতিবাদে অভিমানে জুড়ে গিয়ে এখনো তাকে হাসায়, কাঁদায়, গান গাওয়ায়। এই ঘরটার প্রতিটা বর্গ ফুটে ধরা আছে কবিবরের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ মোড়, বিভিন্ন গৌরবময় মুহূর্ত। ওই তো কবির জাপান সফরের স্মৃতিচিহ্ন। জাপানের রাজার নিজের হাতে দেওয়া সামুরাই তরবারি। সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের প্রতি একটা নিখাদ ভালবাসা, একটা অমোঘ আকর্ষণ সবসময় বোধ করতেন কবি। যে জন্য জীবদ্দশায় তার পাঁচ বার জাপান ভ্রমন। জাহাজ পথে জাপান যাওয়ার অলস সময়ে লিখে ফেলেছিলেন একটা বই যার নাম "জাপান যাত্রী" যেখানে কবি লিপিবদ্ধ করেন জাপান সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনা। সমরোল্লাসে উন্মত্ত জাপানকে তিনি সে বার শান্তির পথ গ্রহণ করতে বলেছিলেন বলে অনেক জাপানি বুদ্ধিজীবি তাঁর বিরুদ্ধে গেছিল। কিন্তু তাতে কি ? শিল্প সাহিত্যের পূজারীর জীবনজোড়া লক্ষই তো হল ভালবাসার মন্ত্র ছড়িয়ে ফেরা। কলমের হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে সমরনায়কদের বিরুদ্ধে অবিরত জিহাদ এই তো একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের জীবন বেদ। "জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর, প্রান্তর তব শান্ত, পর্বত তোমার কঠিন নিবিড়, কানন কোমল কান্ত" লাইন গুলো আবৃত্তি করতে করতে আরও দু পা হাঁটতেই চোখে পড়ল মৃণালিনী দেবীর শাড়ি। বিবাহপূর্বের ভবতারিণী, মাত্র ন বছর বয়সে যিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন, যাঁর নতুন নামকরণ হল মৃণালিনী, তিনি কেমন করে বয়সের সাথে একজন পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছিলেন, কেমন করে কবিবরের সাথে সুখ দুঃখের খেয়ায় ভেসেছিলেন সেই কথা মনে পড়ে গেল বৃদ্ধের। শব্দের কারিগর রবি ঠাকুরকে যে তিনি খুব কাছের থেকে পেয়েছেন। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর একসাথে পথ চলে মৃণালিনী দেবী যেদিন মহাসিন্ধুর ওপারে নতুন পথের সন্ধানে চলে গেলেন, পত্নীবিয়োগ বিধুরা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে –

হে কল্যাণি ! গেলে যদি, গেলে মোর আগে

মোর লাগি কোথাও কি দুটি স্নিগ্ধ করে

পাতিয়া রাখিবে শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে ?"

সত্যিই বিধাতা বোধ হয় ইচ্ছে করেই প্রতিনিয়ত কবিহৃদয়ে তীব্র আঘাত হেনেছেন। সেই কিশোর বয়স থেকেই কবি যার যার কাছে আশ্রয় খুঁজেছেন, সেই প্রিয়জনের বিয়োগশোকে মনকে আরও শুদ্ধ, আরও অনুভবি করে তোলা যেন কোন অদৃশ্য কারিগরের নির্দেশেই। যেমন করে সোনা পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করা হয় – এ যেন তাই। "এই করেছ ভাল নিঠুর হে। নিঠুর হে। এমনি করেই হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো। নিঠুর হে।" কবির প্রিয়জনের কথা মনে পড়লেই আর একজনের কথা মনে পড়ে যায় – কবিসখা, কবির ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড বৌদি কাদম্বরী দেবী। নতুন কোন লেখা শেষ হওয়ার পরের যে ইউফোরিক মুহূর্তটা, যখন মনে হয় কোন এক প্রিয় মানুষকে শোনাতেই হবে এই নতুন সৃষ্টি খানা সেই সময় ছুটে চলে যেতেন কবি বৌদি, সার তার থেকে বেশি পরম সুহৃদ কাদম্বরী দেবীর কাছে। মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তিনি প্রায় সমবয়সী

কিশোর রবির লেখা। কখনো তারিফ করতেন, কখন সমালোচনা। সেই প্রাণসখার ঝুলন্ত শরীর দেখতে হয়েছিল কবিকে। বিচ্ছেদ বেদনায় রক্তাক্ত কবিহৃদয় সাহিত্য সাধনায় নিজেকে পরিপুর্ণ রূপে নিয়োজিত করেছিল। তারপরে পত্নী বিয়োগ, সন্তান বিয়োগ আরও কত প্রিয় মানুষের বিয়োগ যন্ত্রণা বুক পেতে নিয়েছেন তিনি। আর তাই তো কবি হৃদয়ের অন্তরতম কান্না গানের ভাষায় ফুটে উঠেছে যা আজও শ্রোতাহৃদয় ছুঁয়ে যায়।

ব্যথিত হৃদয়ে এই সবই চিন্তা করছিলেন বৃদ্ধ। হঠাৎ একটা পায়ের আওয়াজে চমক ভাঙ্গে। একটা লোক। মুখে কালো কাপড় চাপা। এত রাতে কি চায় ও এখানে ? এত রাতে একে দরজা খুলে দিলই বা কে ? দরজা ভেঙ্গে ঢুকলে আওয়াজ হত। তা নিশ্চয়ই শুনতে পেতেন তিনি। ঘটনাটা কি ঘটতে চলেছে বুঝতে একটা আলমারির আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন তিনি। এতক্ষণে আরও বেশ কয়েক জন কালো কাপড়ে মুখ চাপা লোক ঢুকে পড়েছে সংরক্ষণাগারে। ওদের মধ্যে একজন পশ্চিমদিকের জানলাটা খুলে দিল। জানলার ওপারে বিশাল মাঠ। আর তারপরে আশ্রমের চৌহদ্দি দেওয়াল। ওই দিকটায় বিশেষ কেউ যায় না। জানলার ওপাশেও দাঁড়িয়ে আছে কাল কাপড়ে মুখ ঢাকা আরও বেশ কয়েকটা ছায়ামুর্তি। ইশারা করতেই ঘরের ভেতরের লোকগুলো কাজ শুরু করল। কাঁচের শো কেস ভেঙ্গে ভেঙ্গে বের করতে লাগল রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার্য সমস্ত সামগ্রী। বার্মায় পাওয়া সাম্মানিক রৌপ্য পদক, ওম লেখা সোনার আংটি, জামার সোনার বোতাম, কাফ লিঙ্ক, মৃণালিনী দেবীর শাড়ি, সোনা বাঁধানো নোয়া, রুপোর কফি কাপ, কফি কাপ রাখার তেপয়া, চৈনিক চামচ, হাতীর দাঁতের ঝাঁপি এক এক করে সব জানালা পথে বাইরে চালান হয়ে যেতে লাগল। আলমারির পিছনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমুঢ়। ঠিক কি করা উচিত ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না তিনি ওই অল্প সময়ের মধ্যে। বাধা দেওয়া উচিত ? নিরাপত্তা রক্ষীদের জানানো উচিত ? কিন্তু তিনি এখন তো এ সবের কিছুই করতে পারবেন না। আর ধরিয়ে দেবেন কাকে ? এই কজন নিরন্ন ছিঁচকে চোরকে। পেটের দায় বড় দায়। দিনে দু বেলা পেট ভরানোটাই যাদের কাছে একটা দৈনিক সংগ্রাম তাদের কাছে এই সব মহামূল্য জিনিসের দাম সত্যিই ঠিক কতখানি ? বোধ হয় এক কানাকড়িও নয়। হয়তো এই অসামান্য চুরির পেছনে কোন বড় রাঘব বোয়াল আছে যার প্ল্যান অনুযায়ী, যার অঙ্গুলিহেলনে এই কাণ্ডটা ঘটছে, যার টাকায় বকসিস পেয়েই দরজা খুলে দিয়েছে কোন এক নিরাপত্তা রক্ষী। কিন্তু সে বা তারা তো কোন দিনই ধরা পড়বে না। শুধু শুধু এই উলুখাগড়াগুলো ধরা পড়বে ? এরা ধরা পড়লে বাড়ির একমাত্র উপার্জনের পথটুকুও বন্ধ হয়ে প্রবল সমস্যার মুখে পড়বে কোন স্ত্রী। খিদের তাড়নায় আবর্জনা ঘাঁটবে কোন সাত বছরের ফুটফুটে ছেলে যার শৈশব কেড়ে নিয়েছে এই উন্মত্ত মৃত্যুপথযাত্রী সমাজ। "এই সব মুঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।" এ কথা তো কবিবর নিজেই লিখেছিলেন। মাথার মধ্যে তড়িৎগতিতে চিন্তাপ্রবাহ চলতে থাকে বৃদ্ধের।

কিন্তু এবার ? এবার ওরা কি করছে? হে পরমেশ্বর, এ তো নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। ওদের মধ্যে যে নেতা সে অন্যদের বলল "এবার আমাদের পালাতে হবে। জলদি ওইটাকে ভাল করে বাধা ছাঁদা করে ফেল। আমি নিজে ওটা বাবুর কাছে নিয়ে যাব।" লোকটা যেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল, বৃদ্ধ দেখল, সেখানে শোভা পাচ্ছে সেই পদক যা শুধু কবিবরকে গৌরবান্বিত করে নি, একটা গোটা পরাধীন জাতির ক্ষয়িষ্ণু আত্মবিশ্বাসকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম কোনো ভারতবাসীর পাওয়া বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান – নোবেল পদক। ওরা ওটাকেও ছেড়ে দেবে না ? ওটা নিয়ে যেতে চায় ? যার অঙ্গুলিহেলনে এই ঘৃণ্যতম চুরি হচ্ছে সে কি এতটাই সংবেদনহীন ? না এটা হতে দেওয়া যায় না। এবার ওদের বাধা দিতেই হবে। বৃদ্ধ চিৎকার করে বললেন "না। ওটাকে অন্তত তোমরা ছেড়ে দাও।" কিন্তু এই অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থাকা তার গলা থেকে আদতে একটা আওয়াজও বেরোল না। আর তখন হঠাতই মনে হল "যাক না। এটাও নিয়ে যাক। এই পদকটা বিক্রি করে কোন এক অন্ধকার গৃহে যদি একদিনের জন্যও খুশির রোশনাই জ্বলে তাতেই বুঝি এ পদকের চরম সার্থকতা। প্রতিদিন কিছু পর্যটকের উৎসুক চোখের সামনে একশ বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্যের গৌরবময় যুগের

স্মৃতিচারণ করা ছাড়া আর কিই বা কাজে লাগে এই নোবেল পদক ? মোশান পিকচারের নির্মম পেষণে সাহিত্য এমনিতেই মরণোদ্যত। আর বাংলার মত আঞ্চলিক ভাষার অবস্থা তো আরোই করুণ। হয়তো বা নোবেল সংস্থা থেকে এর একটা রেপ্লিকা দেবে। সেই দিয়েই ওই পুরনো গৌরব প্রচারের কাজ বেশ চলে যাবে। যাক নিয়ে ..."

জানালা পথে সকলে এক এক করে অদৃশ্য হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় লোকটা বেরোনোর সময় বৃদ্ধ আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। "ভাল থেকো বাবা" বলে আশীর্বাদ করলেন সেই দরিদ্র অসৎ মানুষটাকে। সে দেখতে পেল না। শুনতে পেল না বৃদ্ধকে। এই মাত্র ভাঙ্গা নোবেল পদকের শোকেসে নিজের নামটার ওপরে হাত বোলাতে থাকেন বৃদ্ধ। আর তারপর আপন মনে আবৃত্তি করে ওঠেন নিজেরই লেখা একটি কবিতা

শ্রাবণ গগন জুড়ে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দূর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

"মানুষের শক্তির মধ্যে দুটো দিক আছে, একটা দিকের নাম 'পারে' এবং আর একটা দিকের নাম 'পারিবে'। 'পারে'র দিকটাই মানুষের সহজ, আর 'পারিবে'র দিকটাতেই তাহার তপস্যা।"

সঞ্চয় / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনীষা বসু

মধ্যবর্তিনীর চরিত্ররা

করোনা ভাইরাসের ভয়ে সবার মতো আমিও গৃহবন্দী। কোথাও যাওয়া নেই, কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই। বাগান করে যে সময় কাটাবো, শিকাগোর হিমেল হাওয়া আর মাঝে মাঝে তুষারপাতের উৎপাতে তার উপায় ও নেই। তবে কথায় আছে না সব কিছুর একটা ভালো দিকও আছে। এখন অফুরন্ত সময় যত ইচ্ছে বই পড়তে কোন অসুবিধা নেই। হারিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া সব বই পড়ার আনন্দ নতুন করে আবার পাচ্ছি। আমার এক সময়ের সব থেকে প্রিয় বই গল্পগুচ্ছ নিয়ে বসেছিলাম সেদিন। দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততায় অনেকদিন পড়া হয়নি বইটা। তাই বইটা নিয়ে বসে নেশাগ্রস্তের মতো কেবল একটার পর একটা গল্প পড়ছিলাম আর পড়তে পড়তে অবাক হচ্ছিলাম গল্পের অভিনবত্ব দেখে। প্রতিটি গল্পের নিজস্ব একটা চরিত্র আছে, আছে স্বকীয়তা। আর রবিঠাকুরের ভাষার মুন্সিয়ানার কথা তো আমাদের সবার জানা। নিজেদের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা আমাদের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র গুলি মনে হয় রং তুলির খেলা। তাই এত গল্প কিন্তু পড়তে কখনো একঘেয়েমির ক্লান্তি আসেনা। বরং প্রতিটি গল্প যেন নতুন রূপে ধরা দেয়। পড়তে পড়তে অবাক হয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের মানব চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতা, ভাবনার আধুনিকতা আর কৌতুক পরায়ণতার পরিচয় পেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প ''মধ্যবর্তিনী'' আমার প্রিয় গল্পের মধ্যে একটা। মান-অভিমান, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ এই গল্পে যেভাবে রবিঠাকুর ফুটিয়ে তুলেছেন এককথায় বলা যায় তা অসাধারণ। গল্পটা পড়লে বোঝা যায় সে যুগের তুলনায় রবিঠাকুর কতটা আধুনিক মনস্ক ছিলেন। আবার গল্পটার মধ্যে মাঝে মাঝেই প্রচ্ছন্ন কৌতুক রসের আভাস ও পাওয়া যায়। যেমন কবি লিখেছেন — ''হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। -------- কিন্তু, বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতি মুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই''। যতবার গল্পটা পড়ি ততবারই যেন হরসুন্দরী নতুন ভাবে মনের গভীরে দাগ কাটে। গল্পে হরসুন্দরীর চরিত্রের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব লেখক যেভাবে ফুটেয়ে তুলেছেন এক কথায় তা অনবদ্য। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ হরসুন্দরীর তুলনায় নিবারণের চরিত্র অনেক দুর্বল আর ভীরু দেখিয়েছেন। গল্পটা পড়তে পড়তে হরসুন্দরীর অভিমান আর কষ্টে মন খারাপ হয় আর দুর্বলচিত্ত নিবারণের উপর রাগে বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে। চরিত্র বিশ্লেষণ, আধুনিকতা, কৌতুক রস সবকিছুর এক সুন্দর মেল-বন্ধন আমি খুঁজে পাই এই গল্পে।

''মধ্যবর্তিনী''-র হরসুন্দরী আট বছর বয়েসে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি আসার পর, জীবনের সাতাশটা বছর শুধু চাল, ডাল, নুন, চিনি ইত্যাদি মামুলি সব জিনিষ নিয়ে কাটিয়েছিল। তাই নিয়ে ওর মনে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না। জীবন ছিল খুব সহজ সরল গদ্যের মতো। চাঁদ, আকাশ, ফুল, পাখি নিয়ে কাব্য করার কথা বা ইচ্ছে মনের কোন সুদূর কোণেও কখনো উঁকি দেয়নি। কিন্তু অসুস্থ হয়ে চল্লিশ দিন বিছানায় শুয়ে থাকার সময় হরসুন্দরী প্রথম অবকাশ পেয়েছিল নিজের মনের খোঁজ নেবার। জানালার বাইরে প্রকৃতির রং বদলের নানা রূপ দেখতে দেখতে উপলব্ধি করেছিল সংসারের নিত্য দিনের মোটা সব কাজ ছাড়াও জীবনের আরও একটা দিক আছে। অন্য রকমের এক আনন্দ, ভালোলাগায় ওর মন ভরে উঠেছিল। কি এক অজানা পাওয়া না পাওয়ার ভাবানায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। হরসুন্দরীর অসুস্থতা ওর স্বামী নিবারণের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এনেছিল। ওদের দুজনের এই পরিবর্তন সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন রবিঠাকুর। হরসুন্দরীর অসুস্থতার আগে নিবারণের সময় কাটত দিনেরবেলা অফিস আর সন্ধ্যায় প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়ির আড্ডায়। হঠাৎ হরসুন্দরীর অসুস্থতাতে কি করবে বুঝতে না পেরে চিন্তিত নিবারণের অফিস, রামলোচনের বাড়ীর সান্ধ্য আড্ডা সব

বন্ধ । বারান্দায় বসে তামাক খায় আর মাঝে মাঝে হরসুন্দরীর বিছানার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করে – ''কেমন আছ'' । সাধারণ এই কুশলবার্তা প্রশ্ন শুনে আনন্দে চোখে জল এসে যেত হরসুন্দরীর । কথা না বলে নিবারণের হাত ধরে শুয়ে থাকত । প্রায় আজন্ম চেনা স্বামীকে কেমন যেন অচেনা মনে হতো । স্বামীকে আগে কখনো এতটা কাছে পায়নি হরসুন্দরী । স্বামীর এতটা মনোযোগ ও কোনদিন পায়নি । ওদের দুজনের জন্যই এটা নতুন । দুজনেই যেন দুজনকে নতুন চোখে দেখছে । হরসুন্দরীর অসুস্থ হওয়ার আগে সারাদিনের পর যখন রাত্রে ওদের দেখা হতো তখন ওরা মামুলি সাংসারিক কথাবার্তা বলতো । তাতে প্রেম-ভালোবাসার কোন আভাস থাকতো না । এখানে আবার রবীন্দ্রনাথের লেখায় কৌতুক রসের পরিচয় পাওয়া যায় – ''সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়-ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষ ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ-পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবন্ধ করেন নাই'' । প্রতিদিনের এই গতানুগতিক গদ্যময় জীবন নিয়ে হরসুন্দরী বা নিবারণের মনে কোন দুঃখ বা অভাব বোধ ছিলনা । ওদের যে ভালোবাসা ছিল না তা নয় । কিন্তু তা নিয়ে কোনো কাব্য ছিলনা । আবেগের বাড়াবাড়ি ছিলনা ।

অবশ্য মনের এই আনন্দ বা ভালো লাগার কারণ হরসুন্দরীর কাছে খুব যে পরিস্কার ছিল তা না । আবার যখন দুর্বল হরসুন্দরী শীর্ণ হাতে পাশে বসা নিবারণের হাত ধরে ''প্রেমাদ্র সকৃতজ্ঞ'' চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকত তখন নিবারণের মনও এক অচেনা নতুন ভালো লাগায় ভরে উঠত । অনাবিল এক প্রেমের বন্যায় ভেসে যাওয়া হরসুন্দরীর একদিন মনে হল একটা বড় কিছু, একটা নতুন কিছু করবে সাতাশ বছরের পুরোনো স্বামীর জন্য । কিন্তু কবির ভাষায় নিঃসন্তান হরসুন্দরীর – ''ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী'' । অনেক ভাবনা চিন্তার পর ঠিক করলো – ''স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে । ভাবিল স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে । স্বামীকে যে ভালোবাসে তাহার পক্ষে সপত্নীকে ভালোবাসা কী এমন অসাধ্য ।'' একদিন রাত্রে স্বামীর চুলে আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে হরসুন্দরী স্বামীর কাছে নিজের মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলো – ''আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো'' ।

একরকম জোর করেই কিশোরী শৈলবালার সাথে নিবারণের বিয়ে দেয় হরসুন্দরী । অবশ্য প্রথমে বিয়ে করার কথা অসম্ভব মনে হলেও বারবার হরসুন্দরীর অনুরোধ শুনতে শুনতে নিবারণের ও বিয়ে করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করার ইচ্ছে যে হয়েছিল তা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন রবিঠাকুর – ''একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, বুড়াবয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না'' । বুঝতে অসুবিধা হয়না রবিঠাকুরের মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা ছিল অসীম ।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম ইচ্ছে থাকা সত্বেও যখন লজ্জায় নিবারণ ভাব করতো শৈলবালাকে বিয়ে করে ভীষণ বিপদে পড়েছে তখন হরসুন্দরীর বেশ মজাই লাগত । নিবারণকে বলতো – ''আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই'' । অবশ্য খুব বেশী দুঃখিত হতো না তার জন্য । নানারকম কৌতুক করতো দুজনের মধ্যে ভাব করাবার জন্য । কিন্তু হায় নারীর মন । সব কিছু ত্যাগ করা গেলেও স্বামীকে যে কখনো অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় না অনেক দেরীতে বুঝতে পেরেছিল হরসুন্দরী । ভেবেছিল স্বামীর ভালোবাসার অর্ধেক অকাতরে ছেড়ে দিতে পারবে । কিন্তু যেদিন দেখেছিল নিবারণ ওকে লুকিয়ে অফিসে না গিয়ে দরজা বন্ধ করে শৈলবালার সাথে কড়ি খেলছে সেদিন হরসুন্দরী প্রথম উপলব্ধি করতে পারল নিজের অবস্থা । বুঝতে পারল অর্ধেক না স্বামীর ভালোবাসার সম্পূর্ণ ভাগটাই এখন শৈলবালার । দুঃখ কষ্টে ওর মনে হয়েছিল কেন এই লুকোচুরি ? আমি নিজেই তো ওদের বিয়ে দিয়ে ছিলাম । আট বছর বয়সে বিয়ের পর যে শয্যার অধিকার ও পেয়েছিল সেটা সাতাশ বছর পর ছেড়ে দেওয়া যে কত কঠিন সেটা বুঝতে পেরে অভিমান করে বলেছিল – ''তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম'' । এখানে আবার দেখা যায় রবিঠাকুরের মানব চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতা । আনন্দের সময় যা খুব সহজ দুঃখের সময় সেটাই যে কত কঠিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুন্দর ভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন ।

স্বামীর ইচ্ছে বুঝতে পেরে তীব্র অভিমানে হরসুন্দরী নিজের বিয়ের বেনারসি আর সমস্ত গয়না দিয়ে শৈলবালাকে সাজিয়ে দিয়ে মনে মনে ভেবেছিল – ''এক সময় আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষ রেখা

পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সে দিন আসিল এবং কখন সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না।'' পড়তে পড়তে অবাক হচ্ছিলাম ভেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়ে না হয়েও কি করে এভাবে হরসুন্দরীর মনের ছবিটা তুলে ধরেছেন। হরসুন্দরীর তীব্র কষ্টের আর সুগভীর অভিমানের চিত্র লেখক এখানে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এককথায় তা অতুলনীয়। নিজের বিয়ের বেনারসি আর গয়না সপত্নীকে দেবার মধ্যে হরসুন্দরীর স্বামীর প্রতি কত যে অভিমান ছিল গল্পটা পড়ে তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়না। আবার এখানে হরসুন্দরীর চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও লক্ষ্যণীয়। স্বামীর অনাদরে জাগতিক জিনিষ পত্রের প্রতি ওর অনীহা-র চিত্র রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সুস্পষ্ট — ''হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নির্বোধের মতো এ-সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর-একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে; এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব, সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে''। আমার মনে হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষেই সম্ভব এত সুন্দর ভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমানের চিত্র বর্ণনা করা। অল্প শিক্ষিত হরসুন্দরীর কথা ছেড়ে দিই এখনও বেশীর ভাগ মেয়েদের কাছে গয়না নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয়। কজন পারবে সেই গয়না অন্যকে দিতে ? কিন্তু হরসুন্দরীর মনে হয়েছিল স্বামী যখন নিজের রইল না তখন এইসব পার্থিব জিনিষের আর মূল্য কি ? স্বামীর ব্যবহারে হরসুন্দরীর দুঃখ-কষ্ট আর অভিমানের ছবি এখানে যেভাবে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তার থেকে বোঝা যায় ঠাকুরের মানব চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে নিত্যদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ বোঝার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল।

এই গল্পে হরসুন্দরীর তুলনায় নিবারণের চরিত্র অনেক ভীরু, দুর্বল আর চঞ্চলমতি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চরম বিপদের সময়ও নিবারণ নিজেকে আড়ালে রেখে হরসুন্দরীকে শৈলবালার কাছে পাঠাতে চেয়েছিল গয়না চাইতে। দেনায় জর্জরিত নিবারণের শত অনুরোধেও যখন শৈলবালা গয়না দিতে কিছুতেই রাজী হয়নি তখন অন্য কোন উপায় না দেখে নিবারণ নিজেদের বসত-বাড়ি বিক্রী করে দেনা শোধ করেছিল। কিন্তু শৈলবালার গয়নার বাক্সের তালা ভাঙার সাহস হয়নি নিবারণের। আবার শৈলবালার মৃত্যুর পর প্রথমে আঘাত পেলেও একটু পরেই মনে মুক্তির আনন্দ অনুভব করেছিল। আদরের শৈলবালাকে মনে হয়েছিল দুঃস্বপ্ন আর এতদিনের অবহেলিত হরসুন্দরীকে মনে হয়েছিল চিরজীবনের সঙ্গিনী। এই গল্পে নাড়ি-পুরুষ চরিত্রের জটিলতার বর্ণনা লক্ষ্যণীয়। তবে আমার সব থেকে অসাধারণ লেগেছে গল্পের শেষটা। শৈলবালার মৃত্যুর পর — ''একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়ম-মত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু, এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল। হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল; কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।''

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার বা চিন্তার মৌলিকতা, আধুনিকতা আর মানব চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতা সুস্পষ্ট। ভেবে অবাক হই যে সময়ের তুলনায় রবিঠাকুরের চিন্তাধারা কতো আধুনিক ছিল। গল্পটা লেখা হয়েছে বাংলার ১৩০০ সালে, আজ থেকে ১২৭ বছর আগে। তখনকার কথা ছেড়ে দিই এখনও অনেক পুরুষেরা বিয়ে করা বৌকে নিজের সম্পত্তি মনে করে যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে ভাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই গল্প দেখিয়েছেন নিবারণ দুর্বল চরিত্রের ভীরু পুরুষ ছিল কিন্তু অমানুষ ছিল না। শৈলবালার মৃত্যুর পর নিবারণ খুব সংকোচের সঙ্গে হরসুন্দরীর ঘরে এসে শুয়েছিল, নিজের বিয়ে করা বৌ বলে কোন জোর জবরদস্তি দেখায়নি। বরং গল্পটা পড়ে বুঝতে আসুবিধা হয়না যে নিবারণ নিজের কার্যকলাপে বেশ লজ্জিত হয়েছিল। চরিত্র বর্ণনায় এখানেই রবীন্দ্রনাথের জিৎ আর ভাবনার আধুনিকতার পরিচয়।

হয়ত অপ্রাসঙ্গিক তবু আরও একটা ব্যাপার নিয়ে এখানে আমার একটু লিখতে ইচ্ছে করছে। এখনও কি এক-ই ব্যাপার হয় না ? এযুগের হরসুন্দরীরা হয়তো স্বামীকে বিয়ে দেয়না। তবে প্রায় তো শোনা যায় যে এখনকার অনেক হরসুন্দরীরা আর নিবারণরা নিজেরাই 'এক্সট্রা মেরিটাল' বা পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। শুনি সেটা নাকি নিন্দনীয় নয়। আজকালকার এই সদা ব্যস্ত জীবনের মাঝে সেটা নাকি একটা খোলা জানালা বা বারান্দা। বলা হয় ওটা হলো একমুঠো খোলা হাওয়া যা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে। তবে সেটা কি সত্যি ? যতই আধুনিক হই না কেন আমার

মতে পরকীয়া হলো পরকীয়া। স্বামী বা স্ত্রী যেই জড়িয়ে পড়ুক, অন্যজনের পক্ষে সেটা যে কত দুঃখজনক আর অপমানকর তা ভুক্ত ভোগীরাই শুধু জানে। পরকীয়া মেনে নেওয়া সত্যি কি কঠিন না ? ভুল বুঝে ফিরে এলেও সম্পর্ক কি আবার আগের মতো হয় ? ক্ষমা করা কি এতই সহজ ? দুজনের মাঝে একটা জীবিত স্মৃতি বা একটা মৃত সম্পর্ক কি মাঝে মাঝেই এসে হানা দেয় না ? যাকে ''কেহ লঙ্ঘন'' করতে পারে না। ছোটোবেলায় ঠাকুরমার কাছে শোনা একটা কথা দিয়ে শেষ করছি — ''কাচে একবার ফাটল ধরলে তা যতই সুক্ষ্ম হোক না কেন সেটা কিন্তু কখনো আর জোড়া লাগেনা''।

মনীষা বসু — জন্ম কলকাতায়। সত্তর দশকে বিয়ের পর থেকে শিকাগোবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। Purdue University থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি এস ডিগ্রি। পেশায় আই. টি.। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় অবসর — বই পড়া, গান শোনা, লেখা আর বাগান করা।

''সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেছে পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েছে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দী। সেই লোকালয়ের দাবি মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখতে পারি নে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর-একটা মুখ অন্ধকার, তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেলছে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।''

— জাপান যাত্রা

তপনজ্যোতি মিত্র

এক অমলের কাহিনী

তার শৈশবের সেই দিনটি হতো এক বিশেষ উৎসবের দিন, এক অসীম শ্রদ্ধার দিন, গভীর আবেগের দিন।

একটি টেবিলকে সুন্দর ভাবে সাজানো হতো, আর সেখানে রাখা এক ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম জানিয়ে দিন শুরু হতো, সেখানে থাকতো হলুদ মলাটের কয়েকটি বই, বড় হয়ে সে জেনেছিলো সেই বইগুলি সেই ঠাকুরেরই লেখা, তারপর সেই বইগুলি তার আজীবনের সঙ্গী হয়ে গেছে ।

অনুষ্ঠান শুরু হতো, কেউ গাইতো গান – 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি, আপনারে করো উন্মোচন', কেউ করতো কবিতাপাঠ – 'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা নিশীথবেলা', আর তার গায়ে কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠতো ।

ঠাকুরের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে সে সেই দীপ্ত, গাঢ়, গভীর চোখদুটির দিকে তাকিয়ে থাকতো, আর কখন সে সমুদ্রতীরে কুড়িয়ে পাওয়া তার ভালোবাসার ঝিনুকগুলি ঠাকুরের ছবির কাছে রেখে যেত।

অনেক পরে যখন সে তার মাতৃভাষার প্রতি আবেগে 'বুকের মধ্যে বর্ণমালা' লিখেছিলো, তখন সে উপলব্ধি করেছিল সেই ঠাকুর জীবনের এক মহান রূপকার – কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সঙ্গীত রচয়িতা, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী, এক অনলস কর্মী – সব কিছু ।

তার প্রিয় মাতৃভাষাকে ঐশ্বর্যময় করে, গর্বিত করে, আবেগমথিত করে হাজার হাজার বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন তার কবি ।

আর তার জীবনে রহস্যময়তার আকাশ খুলে দিয়েছিলেন ভুবনডাঙার সেই কবি, জীবনের সেই রহস্যময়তা তার আজো ঘোচেনি ।

যেন সেই ভুবনডাঙার কাছেই সে বিচরণ করেছে সারা জীবন ।

তার দরোজা খুলে এসেছিলেন সেই ঘুমভাঙানিয়া, ডেকেছিলেন – জেগে আছো তো অমল ? ঘুমিয়ে পড়ো না, তোমার রাজা আসছেন ।

অমল জেগে থাকে, কখন রাজা তার জীবনের মাঠে এসে দাঁড়াবেন ।

জেগে থাকতে থাকতে রাত গভীর হয়, অমল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়, তাকে ডাক দেয় অনন্ত মহাপৃথিবী তার নক্ষত্রময় আকাশের অসীম সৌন্দর্য নিয়ে ।

তার মনে পড়ে সে একদিন সেই ভুবনডাঙার মাঠে গেছিলো, সেই সোনাঝুরি, সেই খোয়াই, সেই কোপাই নদীর কাছে মগ্নতায় দাঁড়িয়ে থাকা ।

তার মনে হয়
কবি যেন এক রাতে বসে আছেন শান্তিনিকেতনের গাছের তলায়
ভাবছেন পরবর্তী লেখাটির কথা
তাঁর চেতনার বিকাশের কথা
ভাবের আবরণ খুলে দেওয়ার কথা ।

আর তখনই হয়তো তাঁর মনে পড়েছিল
প্রলুব্ধতার পাহাড়ে এরকমই এক রাতে বসেছিলেন আর এক মহামানব
চল্লিশ দিন অনশনের পর সত্যান্বেষী, মানবধর্মী মানুষটির সারা মননে ভরে উঠছে জ্ঞানের স্বর্গালোক।

তাই সব প্রলোভন জয় করে সেই মানুষটি বলেছিলেন – মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না ।

সেইরকম যেন এক মহা সত্য উপলব্ধি করেছিলেন কবি, অনুভব করেছিলেন 'অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা, অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা যেন বাণী খুঁজে ফিরেছে তাঁর চিত্তাকাশে' ।

আবার কলম তুলে নিয়েছিলেন কবি, সৃষ্টি করেছিলেন অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, লিখেছিলেন চিঠি, মনের গহন সৌন্দর্য থেকে এঁকেছিলেন ছবি, মন উতল করা গানে গানে ভরিয়ে দিয়েছিলেন হৃদয় ।

সুধা, রঞ্জন আর নন্দিনীর সঙ্গে অমল অপেক্ষা করেছিল – কখন আসবেন রাজা ।

তারপর একসময় তারা উপলব্ধি করেছিল – এই অনন্ত আকাশের অসীমতায়, এই বিস্তারিত ভুবনজোড়া মায়াময়তার ভেতরে, এই মেঘময় এক বাদলঝরা দিনের আবেগময়তায়, এই তরুণ বসন্তের রঙে রাঙিয়ে থাকা এক অম্লান পৃথিবীতে তারা সবাই রাজা ।

জীবনের গভীরতম দুঃখ, বা অপরূপতম বিস্ময়ে বা হৃদয় উজ্জ্বলতম আনন্দে অমল শতবর্ষ পরের সেই কবিতাখানি পড়েছিল ।

যেন কেউ তার হৃদয় স্পর্শ করে বলেছিল
'হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো'

অমল জেগে থাকে, তার দুই করতলে ধরা থাকে সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রদীপ, তার অরূপরতন ।

শ্রেয়সী দাস

রবীন্দ্রনৃত্য – এক অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্য শৈলী

রবীন্দ্রনৃত্য আর পাঁচটা সাধারণ নৃত্যের ধারার থেকে ভিন্ন। এটি ভিন্ন তার গতি, প্রকৃতি ও চলনে। রবীন্দ্রনৃত্য তার পরিবেশনার একান্ত নিজস্ব ধরন ও সাবলীলতায় দর্শকের আত্মাকে স্পর্শ করে। এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিল্পকর্মের মতোই কোনো প্রাদেশিকতায় আবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের সাতটি চিরায়ত বা ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর এবং প্রচলিত লোকনৃত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনৃত্যে ব্যাপ্ত ।

রবীন্দ্রনাথ তার নিজের ভাষায় বলেছেন যে, রবীন্দ্রনৃত্য হলো এমন একটি নৃত্যশৈলী যা বিশুদ্ধ আনন্দ ও মুক্তির প্রকাশ। বস্তুত রবীন্দ্রসংগীত সহকারে অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশকে চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনৃত্য বলা হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলিকে একটু কাছ থেকে বিশ্লেষণ করলেই তার সর্বগ্রাহিতার বৈশিষ্টগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনৃত্য তার শিল্পের অন্যান্য ধারার মতোই ক্রমবিবর্তমান ও নতুনের দিশারী । সে জন্যই হয়তো তার মঞ্চস্থ নৃতনাট্যগুলি প্রতিবার নতুনত্বের ছাপ রেখেছে উপস্থাপনায় ।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তমগুলি হলো –

কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, চণ্ডালিকা, বাল্মীকি প্রতিভা, শ্যামা এবং চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা এই তিনটি নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনৃত্যের নিউক্লিয়াস ও সার্বিকভাবে রবীন্দ্রনৃত্যের শৈলীকে বহন করে।

রবীন্দ্রনৃত্য প্রকৃতঅর্থেই মনিপুরী, কথাকলি, মোহিনীনাট্যম, ভরতনাট্যম, কত্থক প্রধানত এই পাঁচটি চিরায়ত বা ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর মিশেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দক্ষিণবঙ্গের বাউল নৃত্য, উত্তরবঙ্গের জরি ও রায়বংশী নৃত্য এবং গুজরাটের গর্বা নৃত্যের আঙ্গিকের অভিযোজনও রবীন্দ্রনৃত্যে চোখে পরে । রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্য বিভিন্ন সময়ে বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্ম-চিন্তন, আধ্যাত্মিক মৌলবাদ, এমনকি টপ্পা, ধামাল ও পাশ্চাত্য সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ।

রবীন্দ্রনৃত্যের ভঙ্গি ও প্রকাশে মানব মনের প্রতিটি অনুভূতি যেমন দুঃখ, রাগ, অনুরাগ, অভিমান, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে পরিবেশিত । যেমন মনিপুরী নৃত্য ভক্তিরসের প্রকাশে, কথাকলি নৃত্য বীর রসের প্রকাশে, ভরতনাট্যম তার অভিনয়ের আঙ্গিকে রবীন্দ্রনৃত্যকে তার অদ্বিতীয়তায় সিক্ত করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এইসব নৃত্যশৈলীর যেটুকু রবীন্দ্রনৃত্যের ভাবের সাথে সহবাস করে, কেবল সেটুকুই তাতে সিঞ্চন করেছেন আর বাকিটা বাদ দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। আবার রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের অন্যান্য অনেক দেশের প্রধান নৃত্যশৈলীগুলোর প্রভাব লক্ষিত হয় ।

কার্যত রবীন্দ্রনৃত্য ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যশৈলীর ধারায় ও সময়ের পরিধিতে একটি আধুনিক নৃত্যশৈলী হলেও, এটি বর্তমানে একটি নতুন ক্লাসিকাল ফর্ম হিসেবে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনৃত্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির মতোই তার সর্বোচ্চ মানের ভাব-মানসের ধারায় সিঞ্চিত ও সেই কারণেই এক চির অবিনশ্বর কালজয়ী নৃত্য শৈলী হিসেবে সময়ের দলিলে থেকে যাবে চিরকাল।

শ্রেয়সী দাস : সিডনীনিবাসী ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার শ্রেয়সীর শিরায় উপশিরায় অন্তর্গত আনন্দধারার মতো বয়ে চলেছে সুললিত নৃত্যছন্দ ! ভরতনাট্যম ও রবীন্দ্রনৃত্যে পারদর্শিনী একসময় দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন, এখনও শিক্ষাদানে অক্লান্ত। বাতায়নের ডাকে হাতে তুলে নিয়েছেন কলম, নিপুণ প্রাবন্ধিকের মতোই তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনা।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আমার কণ্ঠ হতে

– এস, অনেক দিন পরে। তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না ।

– না না এমনিই নানা কারণে, আসলে আমি খুব একটা organized নই তো তাই ক্লাস বাদ পড়ে যায়।

– শরীর ভালো তো ? তোমার তো গলার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল ?

– হ্যাঁ এখন ঠিক আছে, কিন্তু যা ঠাণ্ডা গরম চলছে! এখন তো যেন কোন ঋতুই আর নেই। একই দিনে সকালে বর্ষা, দিনে গ্রীষ্ম আর রাতে শীতও হতে পারে।

– যা বলেছ। চা খাবে ? বলি দাঁড়াও সুধাংশুকে। অফিস থেকে ডিরেক্ট আসছ তো !

– না না এইমাত্র খেয়ে বেরলাম। বাড়ি হয়ে এলাম তো।

– তবু, আচ্ছা একটা কেক খাও।

– আচ্ছা

– এবার বল কি গান শিখবে ?

– জানো, আমি একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কিনেছি। দেশ থেকে আসার সময়ে অনেক ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলাম। দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে কেনা, সচিন দেব বর্মণ, রাহুল দেব বর্মণের সিনেমার গান mainly, ভাবলাম, ফেলে দেব, তার চেয়ে একটা প্লেয়ার কিনি। আজকাল অবশ্য হেমন্তর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছি, সেটা থেকে কয়েকটা গান যদি শেখাও...

– প্লিজ 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়' শেখাতে বলিস না ।

– হা হা হা, না না, অন্য গান। দুটো precisely, "আমার কণ্ঠ হতে" আর "কে বলে যাও যাও" ।

– "আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া", হ্যাঁ, খুব সুন্দর গান, তবে খুব চড়া, ওটা অন্যদিন শেখাব। আজ তাহলে "আমার কণ্ঠ হতে" শেখ। লিখে ফেল, একটু ভালো হাতের লেখায় লিখিস, প্লিজ।

– দাও আওয়াজ, পরের দিন থেকে মুক্তাক্ষরে লিখব যখন, তখন বল...

– হা হা, আচ্ছা লেখ, আমি রেকর্ড করে পাঠাচ্ছি তোকে...

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে ॥
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার-প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে ॥

যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয় যে কী দোল দুলায়ে ॥

– তাহলে পরের দিন পড়া দিচ্ছ, দুটো গানের, এটা আর "লিখন তোমার", ঠিক আছে ?

– ঠিক আছে... আচ্ছা একটা প্রশ্ন ছিল। এই গানটার মানে নিয়ে। এই গানটায় পাখি কে ? এবং কবির কণ্ঠ থেকে গান নিয়ে নিলো সে, অথচ সেই আবার, বাসাও বাঁধছে মনের কুলায়... একটু যদি বুঝিয়ে দাও।

– দেখ, রবীন্দ্রনাথের গানে তো অনেক সময়েই পূজা এবং প্রেম মিলে যায়। সেরকম এটাও ধরা যায় না ঠিক করে। উদ্দিষ্ট ঠিক কে ! একজন কেউ যিনি তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছেন...

– Ok, কিন্তু গানটাতে এত অসম্ভব মেলোডি, তাহলে কেন বলছেন, "গান কে নিল ভুলায়ে"? আমার তো মনে হচ্ছে "গান কে দিল" হওয়া উচিৎ। আমার মনে হয় এখানে "কণ্ঠ" শব্দটা খুব pivotal, তুমি প্লিজ একটু ভেবে বলবে ? আমিও ভাবি।

– Done, নেক্সট ডে পড়া দিবি যখন, তখন আলোচনা।

– Ok থ্যাংকস...

সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এলাম। বাকি কাজ, ডিনারও সারা হয়ে গেল। মন ভেবেই চলেছে। গুরুজি বললেন, যেমন হয় কবির গানে, প্রেমের পাত্রী কখনও ঈশ্বরী হয়ে ওঠেন, কখনও ঈশ্বর হয়ে ওঠেন প্রেমাস্পদ, সেরকমই হবে নিশ্চয়ই।

ধরা যাক এ পাখি কবির প্রেম (প্রেম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যখন)। সেই প্রেমাস্পদ বাসা তো বাঁধতেই পারেন কবির মনে, বেঁধেই আছেন (নাহলে আর মাথা খাবেন কি করে) নিশ্চয়ই। মিলে যাচ্ছে বেশ। মেঘের দিনে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসের মত সেই লাবণ্যময়ীর স্মৃতি (বা সাক্ষাত উনিই) কবির প্রাণে পাখার ছায়া দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ঠিকঠাক; পাখির পাখা, তাল পাখা, ছায়া, হাওয়া... অর্থ সম্প্রসারণ... আগে দেখতে হ্যায়! ভোরের শিউলির মায়াময় পড়ে-থাকা কবিকে এক অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যাচ্ছে; এও বোঝা গেল। কবির নয়ন ভরে উঠছে কেন ? আবেগে নিশ্চয়ই। কিন্তু গোপন গান কে গাইল তবে ? যার স্পর্শে, আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের মোহময় তন্দ্রায় কবি দুলে উঠছেন স্বপ্নিল তরঙ্গে ? এমনই সুরেলা সেই তরঙ্গ, যে কবির প্রাণেও জেগে উঠছে সুর। এসে বসছে কবির গানেও। তাহলে কেন বলছেন কণ্ঠ থেকে গান চলে গেল ? সেই পাখিই নিল ? কণ্ঠ...পাখি... পাখি... কণ্ঠ... কণ্ঠনালী... সোনার মেয়ে... অরুণ, বরুণ, কিরণমালা... কখন যে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছি জানতেও পারি নি। হঠাৎ-ই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি রাত্তির দুটো বাজে। জল খেতে উঠলাম, রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার পথে, বসার ঘরের জানলার প্ল্যান্টেশন শাটারের ফাঁক দিয়ে দেখলাম সাদা আলো। একটু ভয় পেলাম, মোশন-সেনসিটিভ আলোটা কি জ্বলে উঠেছে ? কেউ নেই তো ? অল্প ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ঝকঝকে জ্যোৎস্না।

সিকিউরিটি অ্যালার্ম অফ করে জলের গ্লাস হাতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দুধ-সাদা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ব্যাক ইয়ার্ডের ডেকে রাখা গোলাপ, ভারবানা, প্যান্টাস, জবা, আরও রকমারি ফুলের গাছগুলো। ফিশ পণ্ডের পাশে টগরগাছটাও আনন্দে মেলে দিয়েছে তার ফুলের সম্ভার, গোটা গাছটা সাদা হয়ে তাকিয়ে রয়েছে পূর্ণিমার গোল চাঁদটার দিকে। আরে, মনেও ছিল না, আজ তো বুদ্ধপূর্ণিমা। দূরে, বেড়ার পাশে সাদা জিনিয়াটা, জোসেফ নার্সারি থেকে গতবারের আনা বাল্ব, এবারে বিরাট গাছ হয়েছে। গতকালই দেখেছিলাম কুঁড়িটাকে। আজ অর্ধ-প্রস্ফুটিত ফুলটিকে দেখলাম, হয়ে-ওঠার আনন্দে ডগমগ। সাদা-ছিট লম্বা লাউটা একটু বেঁকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ছোটখাটো মসৃণ চেহারার দেশী লাউটাকে। গোটা বাগানটাই যেন এক মায়াবী মুদ্রায় নেচে নেচে উঠছে, উঠছিল। যেন আমাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। কি রকম একটা আড়ষ্টের মত, নিজেকে আগন্তুক মনে হল। মনে হল ওরা যেন অপেক্ষায় রয়েছে, আমি গেলেই আবার শুরু হবে গোপন মেহফিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ বুজে বসে পড়লাম ঘাসের ওপর। এক, দুই, তিন... পাঁচ মিনিট

পর মনে হল হাওয়া বইছে যেন। এবং সত্যি, ম্যাজিকের মত, দেখলাম, সেই হাওয়ায়, বাগানের সব চেয়ে প্রাচীন অ্যাকাশিয়া গাছটার ধার ঘেঁষে লাগানো বোগেনভিলাটা দুলে দুলে উঠছে। দূরের হাল্কা বেগুনী ভিটেক্স গাছটার ফুলে ভরা ডালও যেন এক বিচিত্র ভাষায় দুলে উঠে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে সদ্য-ফোটা জিনিয়ার মাথা। লাউয়ের হাল্কা সবুজ, বিরাট পাতা, আর তার পাশে পুঁই-এর ঝকঝকে গাঢ় সবুজ পাতার ওপর পিছলে যাচ্ছে চাঁদের আলো। গোটা বাগানটা যেন এক অদৃশ্য অর্কেস্ট্রা পরিচালকের ছড়ির তালে তালে নেচে নেচে উঠছে। ঠিক তখন, সেই অদ্ভুত মুহূর্তে বুঝলাম, জানো গুরুজি ! কবির গানের এই পাখিটির পরিচয়।

যে গান আজ আমার বাগানের লাউ-পুঁই-বোগেনভিলা-জিনিয়ারা শুনছে, সেই একই গান কবি শুনতে পেয়েছিলেন, পেতেন। ভোরের ঝরা শিউলিতলার মায়াবী জ্যোৎস্নার গান, সেইই তো সেই পাখি। শ্রাবণের আকূল হাওয়া যখন যূথীর বনকে দুলিয়ে দিয়ে চলে যেত, মন-কেমন করা বাদলা দিনের হঠাৎ ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে, মেঘের সেই ছায়া, যেন সেই পাখিরই পাখা। তার সেই ঘন নিবিড় আশ্রয়ে বসে কবির মনও জুড়িয়ে যেত। মেঘের সেই মন্দ্র-সঙ্গীতে, ভোরের বেলায় ফুল কুড়োতে আসা কিশোরীর লঘু পায়ের আশে, টুপটাপ খসে-পড়া শিউলির মনের গানে, কবিও কেঁপে উঠতেন যে। আধো-তন্দ্রায় বেজে বেজে উঠে, সেই সুর, জাগাত তাঁকে স্বপ্ন এবং জাগরণের মাঝের সেই মুহূর্তটিতে। নিখিলের তরঙ্গ-প্রবাহে নিরন্তর বইতে থাকা সেই গানের পাখি, মনের কুলায় বাসা-বাঁধা, সেই তো এনে দিল সুর, কবির গানেও।

এবং সে সুর শুনে আমরা মোহিত। কিন্তু কবির মনে পরিতাপ, অনুতাপই যেন, বলা যায় প্রায়; যে, সেই প্রাণের গান, পাখির ডানার আশ্রয়ের সেই নিবিড় সুর, শিশিরসিক্ত শিউলির দুলে যাওয়ার, ঝরে যাওয়ার গান, মানুষের পৃথিবীর চোখের আড়ালে, যা কিনা এই বিশ্ব চরাচরকে মাতিয়ে তোলে; যে গানে দুলছে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টির স্বর, সুরে সুরে, নৃত্যের তালে তালে, তাকে যে কবি কিছুতেই ধরতে পারছেন না তার কণ্ঠের গানে। তাই কবি, নিজের সেই অপূর্ণতাকেই বলছেন যেন, বন্ধ করো এ গান, যা ছুঁতে পারে না নিখিলের প্রাণের সেই সুর। কবিরই ভাষায়,

"কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার"।

নিখিল-নৃত্যের সেই ঐক্যতান, গাইতে অপারগ কবি তাই বলছেন, কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসছে, তাঁর নিজের এই প্রকাশের অক্ষমতায়। তাই বলছেন, যেন এই পাখিই তার প্রাণের গান শুনিয়ে রুদ্ধ করল কবির কণ্ঠের গান, "আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিলো"...

অথচ আমরা, তাঁর চির-গুণগ্রাহী ভক্তরা, শুনতে পাচ্ছি, এবং এই গানেই, অসম্ভব সুরের কারুকাজ। এক পঙক্তি থেকে অন্য পঙক্তিতে, এক অদ্ভুত মায়া বিস্তার করে চলেছে সে; আমাদের প্রাণের নদীকে উথলিয়ে দিয়ে, আমাদের শরীরের সমস্ত রোমকূপকে ছন্দ-সুরের আতিশয্যে কাঁপিয়ে দিয়ে। আজ, প্রবাসের এই অদ্ভুত জ্যোৎস্না যেন এক মুহূর্তের জন্যে আমাকে অধিকার দিল, আমার মাটির কবি, আমার প্রাণের কবি, রবিঠাকুরের মনের সেই পবিত্র অঙ্গন স্পর্শের। আনন্দে, অশ্রুতে ভেসে গেলাম গুরুজি। বুঝলাম, তুমি কেন সুরে সুরে বারবার তার কাছে যাও, কি লোভে যাও ! যে পাখি কবির মনে ছায়া ফেলত, সেই পাখি যে তোমারও কণ্ঠেও খেলে বেড়ায়। তাই তো তোমারও গাওয়া, তাই তো আমাদেরও শোনা, শেখা।

শেখাতে শুরু করলে তুমি, আজ পূর্ণ করলেন তোমার কবি, আমাদের কবি। মুহূর্তের জন্যে হলেও, যেন পেলাম, কবিরই ভাষা ধার করে বলি –

"প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে –
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ –
নিখিলের সংগীতের স্বাদ"।

কৃতজ্ঞতা: হিউস্টন-বাসী হওয়ার কারণে আমাদের প্রজন্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রেয়া গুহঠাকুরতার কাছে গান শেখার এক সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে। কবির গানের গভীরতম প্রদেশে, তাঁর নির্জন যাত্রায়, শ্রেয়া সঙ্গী করে নিতে হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর শ্রোতাদের। আমরা, তাঁর শ্রোতারা, আমাদের সীমিত অনুভবেও যেন ধরে ফেলতে পারি কবিমনের গহনের সেই অপূর্ব রূপ। এবং যেহেতু প্রতিটি গান সম্বন্ধেই শিল্পীর ঝুলিতে রয়েছে নানা গল্প, নানা সুর ও স্বর বৈচিত্র্যের তথ্য; এবং বাগ্মিতা এবং কথকতায়ও তিনি যেহেতু বিশেষ পারঙ্গম, প্রতিটি গান শেখার ক্লাসই হয়ে ওঠে এক অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতা। ভিক্ষার ঝুলি ভরে ওঠে মণিমাণিক্যে। কবির গানকে জানা হয় নতুন আলোয়, এবং সেই গানের হাত ধরে, নতুন করে চেনা হয় আপন সত্ত্বাকেও। শিল্পীকে ধন্যবাদ এই ব্যক্তিগত অনুভবের আলো প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্যে।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

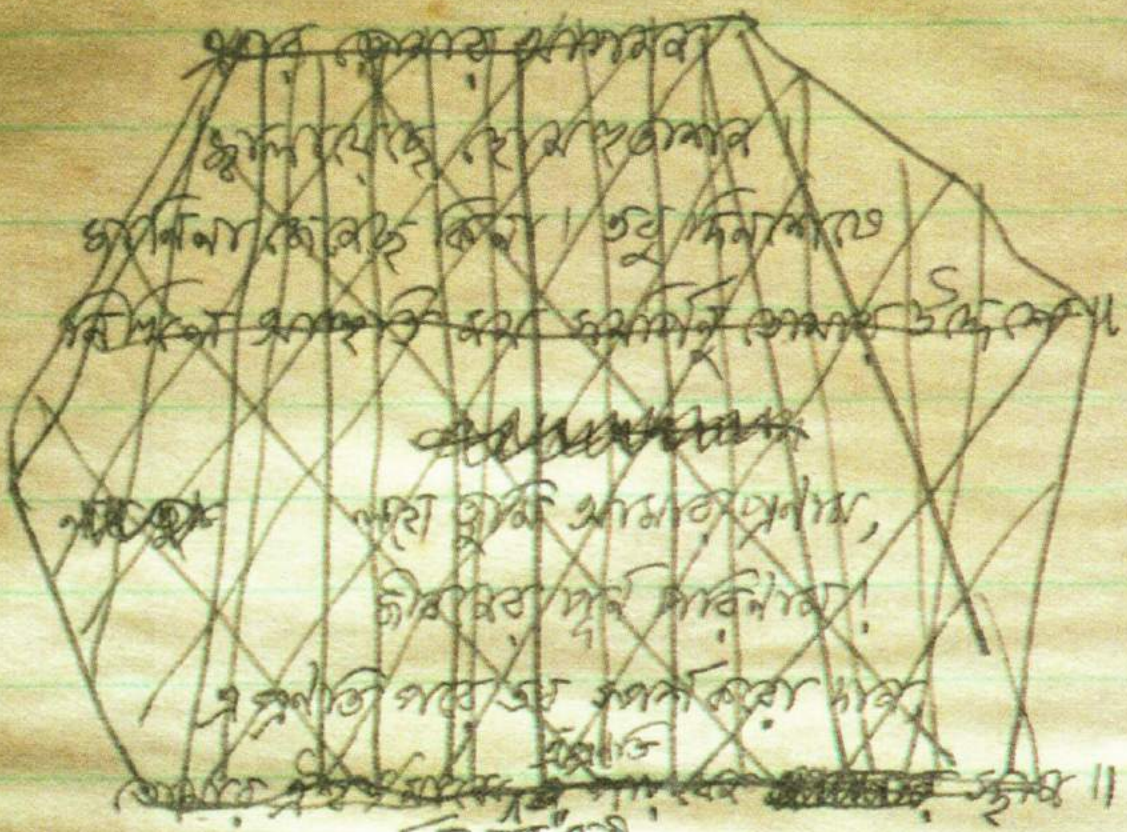

~~[illegible]~~

~~জ্বালায়েছে হোমহুতাশন ||~~

~~জানি না রেখেছি কিনা । তবু দিনশেষে~~

~~[illegible] তোমারি উদ্দেশে ||~~

~~ওগো তুমি আমার প্রণাম,~~

~~জীবনের পূর্ণ পরিণাম !~~

~~এ প্রণতি পরে এই স্পর্শ করো যদি~~

~~[illegible] স্বীকার ||~~

এই বলে অমিত নত হয়ে লাবণ্যকে নমস্কার বললে, "দেবী"। লাবণ্য পরক্ষণে তখনি ধুলোয় বসে পড়ে অমিতর দুই পা বারবার চুম্বন করলে।

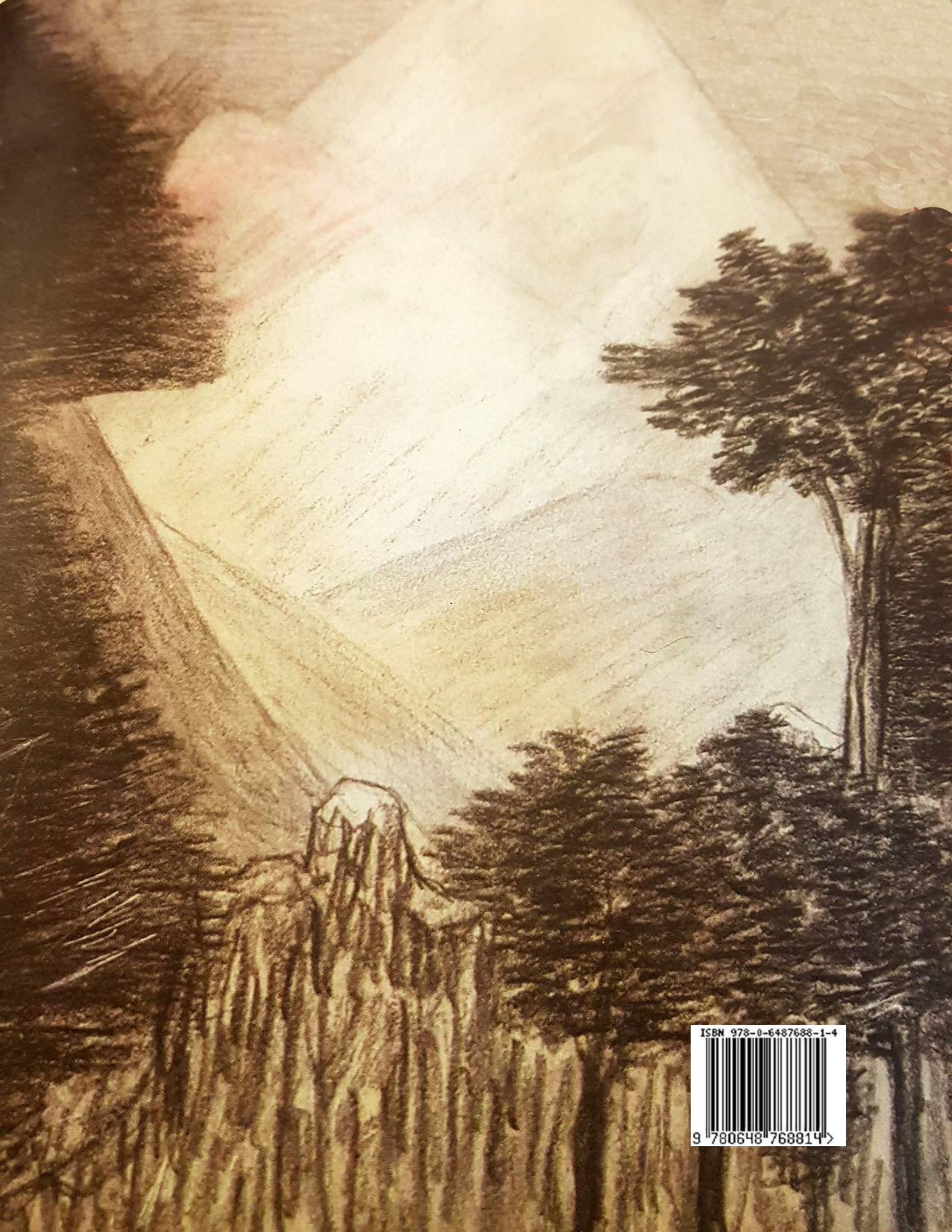

ISBN 978-0-6487688-1-4